ইউনিট-৩

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদসমূহ
(Economy & Resources in Bangladesh)

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নদ-নদীর উপর নির্ভরশীল। নদীমাতৃক বাংলাদেশ অসংখ্য নদী এবং এদের উপনদী ও শাখা নদী দ্বারা বিধৌত। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদ-নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, মৎস্য, বনভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর ও জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কয়লা, লৌহ, পেট্রোলিয়াম, প্রকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পের গুরুত্বও অপরিসীম। কৃষি একদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগান দেয় আবার অন্যদিকে দেশের শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে। বর্তমানে শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনে এখনও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের একমাত্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষে দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করতে হবে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ইউনিটকে নয়টি ভাগে ভাগ করে নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপঃ

- *পাঠঃ ৩.১: বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি*
- *পাঠঃ ৩.২: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্যসমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৩: কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা ও প্রতিকার সমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৪: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৫: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৬: বনজ সম্পদ*
- *পাঠঃ ৩.৭: মৎস্য সম্পদ*
- *পাঠঃ ৩.৮: শিল্প*
- *পাঠঃ ৩.৯: বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও বাণিজ্য*

পাঠ-৩.১

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি
(Agrarian Economy of Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশের কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন; এবং
- কৃষি কিভাবে দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে তা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবেন।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিতে কৃষি অন্যতম বড় খাত। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬২.৩ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত, (বি. বি এস, লেবার ফোর্স সার্ভে; ১৯৯৯-২০০০)। দেশের মোট রপ্তানিতে কৃষিজাত পণ্যের (কাঁচাপাট, পাটজাতদ্রব্য ও চা সহ) অবদান শতকরা ৫.৭৬ ভাগ (২০০১- ২০০২); উৎসঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী। গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরী পোশাক (RMG) রপ্তানীর পরেই কৃষির অবদান। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।১৯৯০ এর দশকের সময়ে বাংলাদেশ কৃষির জন্য এক স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে কৃষিখাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল -০.৬%।

নিম্নের সারনীতে বিগত কয়েক বছরের কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার তুলে ধরা হলোঃ

সারণী: ৩.১.১ : কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হারঃ (শতকরা হারে)

খাত	৯১/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২	০২/০৩ সাময়িক
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৪.৫৭	৪.০৮	৪.৯৩	৪.৬২	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪	৫.২৭	৪.৪২	৫.৩৯
কৃষি	১.৪	-০.৭	-১.৯	২.০	৫.৬	১.৬	৩.২	৬.৯	৫.৫	-০.৬	৩.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৫৪

কৃষির বৃদ্ধির অবস্থা এবং এর প্রয়োগিক দিকঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত ৫% হারে বৃদ্ধি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষি অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, অদ্যাবদি আমাদের অর্থনীতি ঐতিহাসিকভাবেই ৪.৬% হারে বৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, মাথাপিছু উৎপাদনের হার এখন পর্যন্ত ৩% এর কমে রয়েছে।

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আলোচনা করা হলোঃ

১. জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসঃ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশী আসে কৃষি থেকে। তাই কৃষি দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি এবং জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস।

২. প্রধান পেশাঃ কৃষি বাংলাদেশের জনগনের প্রধান পেশা। কৃষিই বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের কর্মসংস্থান যোগায়। কৃষির উন্নতির উপর আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনগনের জীবনযাত্রার মান নির্ভরশীল।

৩. খাদ্যের যোগানদারঃ কৃষি দেশের জনগনের খাদ্য যোগায়। বিভিন্ন সমস্যাজনিত কারণে বাংলাদেশ এখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। এ ঘাটতি খাদ্য আমদানি করতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার এক বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যায়।

৪. কৃষি শিল্পের কাঁচামাল যোগায়ঃ বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নও কৃষির উপর নির্ভরশীল। শিল্পকারখানা প্রসারের জন্য যে সমস্ত কাঁচামালের প্রয়োজন হয় তা মূলত: কৃষি থেকেই আসে। পাট, চা, চিনি, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামালের উৎস হল কৃষি। সুতরাং দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও কৃষির ভূমিকা প্রধান।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনঃ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যও কৃষির উপর নির্ভরশীল। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে থাকে। সুতরাং কৃষি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. কৃষির মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নঃ কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং তারা অধিক শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এবং দেশের অভ্যন্তরে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়। ফলে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে বেকার সমস্যা দূর হয়। তাই দেশের শিল্প উন্নয়ন কৃষির উপর নির্ভরশীল।

৭. সরকারী আয়ের উৎসঃ কৃষি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। জমির খাজনা, কৃষিপন্য পরিবহন বাবদ রেল ভাড়া , কৃষিপন্যের রপ্তানি শূল্ক প্রভৃতি বাবদ সরকারের যথেষ্ট আয় হয়।

উপরোল্লেখিত কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। যার ফলস্বরূপ অবদান হিসেবে দেখা যায় যে এটি দেশের যেমন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগান দেয় তেমনি দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে। কৃষি অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হওয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কৃষি খাতের উন্নয়নের বিকল্প নেই। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় কৃষিখাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি এবং জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।	পাট, চা, চিনি,বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামালের উৎস হলো কৃষি।	কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।
	কৃষির উপর বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগনের জীবন যাত্রার মান নির্ভশীল।	

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি অন্যতম বড় খাত। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরী পোশাক (RMG) রপ্তানীর পরেই কৃষির অবদান। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে কৃষিখাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল -০.৬%।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১.শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশ ---- দেশ।
১.২ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ----।
১.৩ ----- দশককে বাংলাদেশের কৃষির স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যয়িত করা হয়।
১.৪ কৃষির উন্নতির উপর ----- জনগনের জীবন যাত্রার মান নির্ভরশীল।
১.৫ বাংলাদেশে প্রতিবছর ------ থেকে ----- লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হয়।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি কি?
ক) কৃষি খ) শিল্প
গ) বাণিজ্য ঘ) রপ্তানী

২.২ কোন দশককে বাংলাদেশের কৃষির স্বর্ণযুগ বলা হয়?
ক) ৬০ এর দশক খ) ৭০ এর দশক
গ) ৮০ এর দশক ঘ) ৯০এর দশক

২.৩ প্রতিবছর বাংলাদেশকে কি পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হয়?
ক) ১০ - ১৫ লাখ টন খ) ১৫ - ২০ লক্ষ টন
খ) ২০ - ২৫ লক্ষ টন ঘ) ২৫ - ৩০ লক্ষ টন

২.৪ নিম্নের কোনটি কৃষিজ দ্রব্য নয়?
ক) পাট খ) চা
গ) তৈরী পোষাক ঘ) তামাক

২.৫ নিম্নের কোনটি কৃষিখাতে সরকারী আয়ের উৎস নয়?
ক) জমির খাজনা খ) তৈরী পোষাক
গ) কৃষিপণ্যের রপ্তানী শুল্ক ঘ) কৃষিপণ্য পরিবহণ বাবদ রেল ভাড়া

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের কত শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে জড়িত?
২. দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান কত শতাংশ?
৩. বাংলাদেশকে প্রতিবছর কি পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হয়?
৪. কৃষি কিভাবে শিল্পে কাঁচামাল যোগান দেয়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.২

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্যসমূহ
(Major crops in Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি–

- বাংলাদেশে কি কি ফসল উৎপাদিত হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরণের খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রধান ফসল যথা- ধান, গম, পাট, চা এর উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশের ফসলগুলো বছরের কোন কোন সময়ে উৎপাদিত হয়, সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বাংলাদেশে নানা ধরণের ফসল উৎপাদিত হয়। এসব ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ক) খাদ্য শস্য খ) অর্থকরী শস্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, বার্লি, ডাল, তেলবীজ প্রভৃতি অন্যতম এবং অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, চা, তামাক, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান। ১৯৯৬-৯৭ সালে জি.ডি.পি-তে খাদ্যশস্যের ২৪% অবদান ছিল এবং জি.ডি. পি-তে ৭৩% অবদান ছিল অর্থকরী শস্যের। নিম্নে এদের সম্বন্ধে ধারনা দেয়া হলোঃ

১. খাদ্যশস্য (Food Crops)

ক) ধানঃ বাংলাদেশের খাদ্য শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। অতি প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশে ধানের চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশে কৃষিজ ফসল ও খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী। দেশের ৯৯% লোকের প্রধান খাদ্য ভাত হওয়ায় মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৭০% জমিতে ধানের চাষ হয় এবং ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। ১৯৭০-৭২ থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার উল্লেখযোগ্য হিসেবে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির (উফশী) প্রয়োগ।

ধানের শ্রেণী বিভাগ

বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ ধরনের ধান দেখা যায়। এদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে ধানের চাষ হয়। চাষের সময় অনুযায়ী ধানকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন- আউশ, আমন এবং বোরো ধান। বর্তমানে বাংলাদেশে ইরি নামে এক প্রকার উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হয়ে থাকে।

নিম্নে এদের বিবরণ দেয়া হলঃ

- **আউশ ধানঃ** সাধারণত উচ্চ ভূমিতে আউশ ধানের চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু চরাঞ্চলের নতুন উর্বর জমিতেও ব্যাপকভাবে এ ধানের চাষ হয়। এসব অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাসে ধান চাষ করে মে ও জুন মাসে ধান কাটা হয়। ২০০১-২০০২ সালে এ জাতীয় ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ০.৫৯ টন।
- **আমন ধানঃ** দেশের উৎপাদিত ধানের মধ্যে আমন ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের নিম্ন জমিতে আমন ধানের চাষ হয় সবচেয়ে বেশী। আমন ধান দু'ধরনের যথা- ১. রোপা আমন ২. বপন আমন। বপন আমনের ধানের বীজ এপ্রিল- মে মাসে বপন করা হয় এবং নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে কাটা হয় । কিন্তু রোপন করা ধানের চাষই আমাদের দেশে অধিক। ২০০১-২০০২ সালে আমন ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ০.৭৭ টন।
- **বোরো ধানঃ** এ শ্রেণীর ধান খাল, বিল ও নদীর তীরবর্তী নিচু উর্বর পলিযুক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে চারা রোপন করা হয় এবং মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে কাটা হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের পূর্বদিকের বিলসমূহ, সিলেট অঞ্চলে হাওড়, ধলেশ্বরী, মেঘনা, এবং পদ্মা নদীর চর অঞ্চল, গোপালগঞ্জের বিল, রাজশাহীর চলনবিল প্রভৃতি স্থান বোরা চাষের জন্য বিখ্যাত। ২০০১-২০০২ সালে এ ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ১.২৬ টন।
- **ইরি ধানঃ** ইরি ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ৫০ হতে ১০০ মন। চারা রোপন করার মাত্র তিনমাসের মধ্যে ধান কাটা হয়। ইরির ফলন অধিক বলে এর চাষ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, প্রভৃতি অঞ্চলে ইরি ধানের চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিগত কয়েক বছর ধরে একটি উর্দ্ধমুখি ধারা বিদ্যমান রয়েছে। পরপর কয়েকবছর ধরে ফসলের বাম্পার উৎপাদন হওয়ায় বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরের হিসেব অনুযায়ী, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২৬০.৫৮ লক্ষ মেট্রিকটন। এর মধ্যে আউশ ১৮.১ লক্ষ মেট্রিকটন, আমন ১০৭.৩ লক্ষ মেট্রিকটন, বোরো ১১৭.৭ লক্ষ মেট্রিকটন ও গম ১৫.১ লক্ষ মেট্রিকটন।

সারণীঃ ৩.২.১ : খাদ্যশস্য উৎপাদন (১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত) লক্ষ মেট্রিক টন

খাদ্য শস্য	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২	০২/০৩
আউশ	২০.৭	১৮.৫	১৭.৯	১৬.৮	১৮.৭১	১৮.৭৫	১৭.৩৪	১৯.১৬	১৮.০৮	১৮.৫১
আমন	৯৬.৮	৯৪.২	৮৫.০	৮৭.৯	৯৫.৫২	৮৮.৫০	১০৩.০৬	১১২.৫	১০৭.২৬	১১১.১৫
বোরো	৬৫.৯	৬৭.৭	৬৫.৪	৭২.২	৭৪.৬০	৮১.৩৭	১১০.২৭	১১৯.২১	১২৭.৬৬	১২৪.২৮
মোট ধন	১৮৩.৪	১৮০.৪	১৬৮.৩	১৭৬.৯	১৮৮.৮৩	১৮৮.৬২	২৩০.৬৭	২৫০.৮৭	২৪৩.০০	২৫৩.৯৪
গম	১১.৮	১১.৩	১২.৫	১৩.৭	১৪.৫৪	১৮.০২	১৮.৭০	১৬.৭০	১৬.০৬	১৫.০০
ভূট্টা	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
মোট	১৯৫.২	১৯১.৭	১৮০.৮	১৯০.৬	২০৩.৩৭	২০৬.৬৪	২৪৯.০৭	২৬৯.০৬	২৬০.৫৮	২৭০.৯৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৩।

ধান উৎপাদন ও উৎপাদনকারী অঞ্চলঃ

বাংলাদেশের আবাদী জমির প্রায় ৭০% ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়ে থাকে। এদেশের মাটি ও জলবায়ু ধান চাষের বিশেষ উপকারী হওয়ায় এর প্রায় সর্বত্রই ধানের চাষ হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার টন ধান উৎপাদন হয় এবং ২০০০-২০০১ সালে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৫০ লাখ ৮৭ হাজার টনে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হলেও সবচেয়ে বেশী ধান উৎপন্ন হয় বৃহত্তর রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, বগুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা ও নোয়াখালী অঞ্চলে। তন্মেধ্যে আউশ ধানের উৎপাদনে বৃহত্তর যশোর প্রথম, সিলেট দ্বিতীয় এবং কুমিল্লা তৃতীয়। আমন ধান উৎপাদনে বৃহত্তর রংপুর প্রথম, দিনাজপুর দ্বিতীয়, এবং রাজশাহী তৃতীয়। আবার বোরো ধান উৎপাদনে বৃহত্তর কুমিল্লা প্রথম, কিশোরগঞ্জ দ্বিতীয় এবং ঢাকা তৃতীয়। এছাড়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান হিসেবে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের বালাম, দিনাজপুর অঞ্চলের কাটারীভোগ, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিরই ধান এবং নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের কালিজিরা ইত্যাদি ধান খুবই প্রসিদ্ধ।

গমঃ

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরেই গমের স্থান। গম নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। এ গম উৎপাদনের জন্য মাঝারি ধরণের তাপ ও সামান্য বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। এ কারণে বাংলাদেশে শীতকালে গমের চাষ করা হয়। এটি এখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গমের উৎপাদন ও উৎপাদনকারী অঞ্চলঃ

বর্তমানে খাদ্যশস্যের অভাবহেতু বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গমের চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে গম চাষ বেশি প্রসার লাভ করেছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে ১১ লাখ ৩০ হাজার টন গম উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদন ২০০০-২০০১ সালে ১৬ লাখ ৭০ হাজার টনে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর ,ঢাকা, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। তবে এদের মধ্যে দিনাজপুর অঞ্চল প্রথম, পাবনা দ্বিতীয়, রংপুর তৃতীয় এবং রাজশাহী চতুর্থ। বর্তমানে

রাজশাহী বিভাগে অধিক গম উৎপন্ন হয়। এরপরে ঢাকা বিভাগের স্থান। রাজশাহী বিভাগে দেশের প্রায় ৫২% ভাগ, ঢাকা বিভাগে প্রায় ২৪% ভাগ এবং খুলনা বিভাগে ১৫% ভাগ গম উৎপন্ন হয়। তবে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে গমের চাষ অতি নগন্য।

অন্যান্য খাদ্যশস্যঃ

১. বার্লি বা যব (Barley)ঃ

বার্লি গম জাতীয় খাদ্য। এ থেকে আটা প্রস্তুত হয়। দেশে উৎপাদিত বার্লির পরিমান অতি নগন্য। স্বল্প বৃষ্টিপাত এবং সামান্য উর্বর জমিতে যবের চাষ হয়।

২. ভূট্টা (Maize) ঃ

ভূট্টা মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ভূট্টা চাষের জন্য ১০০ সে:মি থেকে ১৫০ সে:মি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন এবং ১০০ সে: থেকে ২২০ সে: উত্তাপ প্রয়োজন। এ জন্য বাংলাদেশে ভূট্টার চাষ খুবই কম। এ দেশের রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে কিছু ভূট্টা জন্মে।

৩. ডাল (Pulses) ঃ

বাংলাদেশে ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে মসুর, ছোলা, মটর, মুগ, মাষ কলাই, খেসারি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলো রবিশস্যের অন্তর্গত এবং দোঁ-আশ মাটিতে ভাল জন্মে। বাংলাদেশে প্রায় ১৭ লাখ ১০ হাজার একর জমিতে বিভিন্ন ধরণের ডালের চাষ হয়। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার টন। বালি মিশ্রিত দো-আঁশ মৃত্তিকায় ডালের চাষ ভাল হয় বলে বাংলাদেশের চর অঞ্চলগুলো ডাল চাষের জন্য বিখ্যাত।

৪. তৈলবীজ (Oil Seeds)ঃ

বাংলাদেশে উৎপন্ন তেল বীজের মধ্যে তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি, রেড়ি প্রভৃতি প্রধান। এদের মধ্যে সরিষা, তিল, চিনাবাদাম প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বালিযুক্ত দো-আঁশ মৃত্তিকায় তিলও তিসির চাষ ভাল হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচুর তৈলবীজ জন্মে। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রায় ১৩ লাখ ১০ হাজার একর জমিতে প্রায় ৬ লাখ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তেল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ন নয়। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার টন ভোজ্য তেলের প্রয়োজন। এর মধ্যে সরিষা ও অন্যান্য তেলবীজ থেকে ৬০ হাজার টনের মতো ভোজ্য তেল পাওয়া যায়। বর্তমানে আমিষ ও ভোজ্য তেলের ঘাট্তি পূরণের জন্য রবি মৌসুমে অপেক্ষাকৃত নিম্নঅঞ্চলে সয়াবিনের চাষ করা হয়।

৫. মসলা (Spices) ঃ

বাংলাদেশে উৎপাদিত মসলার মধ্যে মরিচ, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন, ধনে, জিরা, তেজপাতা ও আদা প্রভৃতি প্রধান। আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ু নানা জাতীয় মসলা চাষের পক্ষে অনুকূল। ফলে দেশেই অনেক মসলা জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তবে এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

অর্থকরী শস্য/ ফসলঃ

যেসকল ফসল সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্য চাষ করা হয় তাদের অর্থকরী ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল গুলোর মধ্যে পাট, চা, ইক্ষু, তামাক, নানা রকমের তেলবীজ, মরিচ, পিয়াঁজ, রসুন, ধনিয়া, তুলা, রাবার প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হবার কারণে বিভিন্ন ধরনের ফসলের মধ্যে অর্থকরী ফসলের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামাল অর্থকরী ফসলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- পাট, চিনি, রেশম প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল আমাদের অর্থকরী ফসল থেকে আসে। পাট, চা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলই বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এসব ফসল রপ্তানি করে বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমাদানি করে থাকে।

পাট (Jute)ঃ

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী বা বাণিজ্যিক ফসল। যা বাংলাদেশের স্বর্ণতন্তু হিসেবে সুপরিচিত। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে এদেশে পৃথিবীর মাত্র ২৬% পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কিছু না

কিছু পাট জন্মে। তন্মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর ,টাঙ্গাইল, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। বর্তমানে পাট উৎপাদনে সাবেক রংপুর অঞ্চল প্রথম, ফরিদপুর অঞ্চল দ্বিতীয়, যশোর অঞ্চল তৃতীয় এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল চতুর্থ। তবে পাবত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী অঞ্চলে পাটের চাষ নেই বললেই চলে।

চা (Tea)ঃ

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। বর্তমানে এটি দেশের ২য় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। দেশে উৎপাদিত চা এর প্রায় ৭০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে একাদশ স্থানের অধিকারী। সাবেক সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলায় চা এর চাষ হচ্ছে। তবে, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চলে দেশের প্রায় ৯০% ভাগ চা উৎপন্ন হয়। চা বাংলাদেশের ২য় প্রধান রপ্তানি যোগ্য ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম চা রপ্তানীকারক দেশ। যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের চা এর প্রধান ক্রেতা। এছাড়া জাপান, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, পোল্যন্ড, বুলগেরিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশও বাংলাদেশ হতে চা আমাদানী করে থাকে।

তামাক (Tobacco)ঃ

বাংলাদেশে কিছু তামাক উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার একর জমিতে বার্ষিক প্রায় ৪০ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কিছুনা কিছু তামাকের চাষ হয়। এদের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চল তামাক চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্তমানে যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলেও তামাক চাষ প্রসার লাভ করেছে।

অন্যান্য অর্থকরী ফসলঃ

অন্যান্য অর্থকরী শস্যের মধ্যে রেশম, রাবার, বার্লি, সুপারি, আলু, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান।

রেশমঃ

রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০ হাজার একর জমিতে তুঁত গাছের চাষ করা হয়। বার্ষিক রেশম উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৪০ হাজার টন। এছাড়াও বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলেও তুঁত গাছ থেকে রেশম সুতা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পানঃ

পান বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই পানের চাষ হয়ে থাকে। এ দেশের সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি, রাজশাহী, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলে পানের চাষ বেশী হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক সর্বমোট প্রায় ৩৩ হাজার একর জমিতে ৬৫ হাজার টন পান উৎপাদিত হয়।

আলুঃ

বাংলাদেশে গোল ও মিষ্টি উভয় প্রকার আলুই জন্মে। ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আলু চাষ হয়। আলু খাদ্য শস্যের অর্ন্তভূক্ত হলেও আলুকে অর্থকরী ফসল বলা চলে। কারন এটি বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট ও চা প্রধান।	বাংলাদেশে নানা ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়।
বাংলাদেশের খাদ্য শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান	বাংলাদেশে কৃষিজ ফসল ও খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী।

সুপারি ও নারকেলঃ

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সুপারি ও নারকেল জন্মে। তবে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী , কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এদের চাষ বেশী হয়ে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশে নানা ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. খাদ্যশস্য ও ২. অর্থকরী শস্য। খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান, গম, বার্লি, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি অন্যতম এবং

অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, চা, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশের কৃষিজ ফসল ও খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী। চাষের সময় অনুযায়ী ধানকে প্রধানত ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন - আউশ, আমন ও বোরো ধান। সাধারণত উচ্চভূমিতে আউশ ধানের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের নীচু জমিতে আমন ধানের চাষ হয় সবচেয়ে বেশী। বোরো ধান খাল, বিল ও নদীর তীরবর্তী নীচু উর্বর পলিযুক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়। যেসকল ফসল সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় তাদের অর্থকরী ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামাল অর্থকরী ফসলের অন্তর্ভূক্ত। পাট, চা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলই বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১.শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের ফসলকে ---------- এবং ---------- ফসল হিসেবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
১.২ ধান একটি ----------ফসল এবং পাট একটি ---------- ফসল।
১.৩ বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির প্রায় ---------- শতাংশ জমিতে ধান চাষ করা হয়।
১.৪ ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ----------।
১.৫ বাংলাদেশে প্রায় ---------- ধরণের ধান দেখা যায়।
১.৬ দিনাজপুর অঞ্চলের ---------- ধান খুবই প্রসিদ্ধ।
১.৭ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ হলো ----------।
১.৮ চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ---------- স্থানের অধিকারী।
১.৯ আলুকে অর্থকরী ফসলও বলা হয় কারণ এটি ----------উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের ফসলকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) ১ খ) ২
গ)৩ ঘ) ৪

২.২ গম কি ধরনের ফসল?
ক) খাদ্যশস্য খ) অর্থকরী ফসল
গ) রবিশস্য ঘ) কোনটিই নয়

২.৩ বাংলাদেশে কত ধরণের ধান উৎপাদিত হয়?
ক) ২০০ খ) ৩০০
গ) ৪০০ ঘ) ৫০০

২.৪ দেশের উৎপাদিত ধানের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশী হয়?
ক) আউশ খ) আমন
গ) বোরো ঘ) ইরি

২.৫ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পাট উৎপাদিত হয় কোথায়?
ক) বাংলাদেশ খ) ভারত
গ) নেপাল ঘ) থাইল্যান্ড

২.৬ সরিষা কোন ধরণের ফসল?
ক) অর্থকরী জাতীয় খ) তৈলবীজ জাতীয়
গ) ডাল জাতীয় ঘ) সব্জী জাতীয়

২.৭ বাংলাদেশের নিম্নলিখিত কোন জায়গায় চা চাষ হয় না?
ক) চট্টগ্রাম খ) পার্বত্য - চট্টগ্রাম
গ) ফরিদপুর ঘ) সিলেট

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের ফসলকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি?
২. ডাল এবং তামাক কোন ধরণের ফসল?
৩. গম উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের জলবায়ু প্রয়োজন?

৪. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল সমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্য সমূহ কি কি? জাতীয় উন্নয়নে অর্থকরী ফসলসমূহের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.৩

কৃষি ক্ষেত্রের সমস্যা ও প্রতিকার সমূহ
(Problems and Remedies in Agri Sector)

এই অংশটুক পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্পর্কে বুঝতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষিতে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ধারনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কিভাবে প্রতিকার করা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশ প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ। দেশের কৃষিকাজ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বাংলাদেশের কৃষির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো - কৃষিক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অধিক ইত্যাদি। নিম্নে দেশের কৃষির সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো:

ভূমির উর্বরতা হ্রাস:

বাংলাদেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই একই জমিতে বহুদিন ধরে চাষাবাদ করার ফলে মৃত্তিকার উৎপাদন শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। উর্বরাশক্তি হ্রাস পাওয়া সত্বেও এর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টাই করা হয়নি। জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাবার ফলেই দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

পুরাতন পদ্ধতির কৃষি ব্যবস্থা:

বাংলাদেশে এখনও সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করা হয়ে থাকে। অজ্ঞতার কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও তাদের চাষাবাদ লাঙ্গল জোয়ালের মাধ্যমে সম্পাদন হয়ে থাকে। এমনকি তারা সঠিক মাত্রায় রাসায়নিক সারের প্রয়োগও জানেনা। এ পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করার ফলে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আমাদের কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদের সাথে তেমনভাবে পরিচিতি ঘটেনি। ফলে জমিতে আশানুরূপ ফসল জন্মে না।

জমির বহুবিভাগ:

বাংলাদেশের কৃষিকাজে জমির খন্ডবিখন্ডতা একটি মারাত্মক সমস্যা। তদুপরি, উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কৃষি জোতগুলো দিন দিন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। ফলে চাষাবাদে বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্ত জমিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা অসম্ভব।

জলবায়ুর উপর নির্ভরশীলতা:

বাংলাদেশের কৃষি কার্যের বেশীরভাগই জলবায়ুর স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। কৃষি কার্যের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা অনস্বিকার্য। বৃষ্টিপাত পানির চাহিদা পূরণ করে থাকে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সময়মত প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হলে ফসল ভাল হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মৌসুমী বায়ুর তারতম্যের কারণে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হয়, যা কৃষিকার্যের অন্যতম বাধা। এজন্য বাংলাদেশের কৃষিকে মৌসুমী বায়ুর জুয়াখেলা বলা হয়।

ভাল বীজ ও সারের অভাব:

বাংলাদেশে কৃষিকার্যের অন্যতম সমস্যা হলো ভাল বীজ ও সারের অভাব। অধিক ফসল জন্মাতে ভাল বীজ ও সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে উন্নতমানের ভাল জাতের বীজ এবং রাসায়নিক সারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তদুপরি অর্থের অভাবে কৃষকগণ ভাল বীজ ও সার ক্রয় করতে পারে না। ফলে এদেশে জমির ফসল খুবই কম।

সেচ ব্যবস্থার অভাব:

সেচ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল হওয়ার কারণে কৃষকদের পানির জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হয়। সময় মতো বৃষ্টিপাত না হলে দেশে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন থাকে। এজন্য রবি ফসলের ফলনও কম হয়। বাংলাদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী পানিসেচ ব্যবস্থার দারুন অভাব রয়েছে। এটি কৃষি সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য কারণও বটে।

মূলধনের অভাব:

বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম সমস্যা হলো মূলধনের অভাব। এর জন্য গরীব কৃষকগণ ভূমিতে অধিক পরিমান মূলধন খাটিয়ে উৎপাদন বাড়াতে পারে না। উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার মতো সামর্থ্য তাদের না থাকায় সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না।

পঙ্গপাল ও শস্যের রোগ সমূহ:
বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গের আক্রমনে আমাদের দেশে প্রতি বছর যথেষ্ট ফসল নষ্ট হয়। অজ্ঞতার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করার প্রবণতা কৃষকদের মধ্যে খুবই কম। অজ্ঞতার কারণে কৃষকরা সঠিক পরিমাণে জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করেন না।

মৃত্তিকা ক্ষয়:
ভুমি ক্ষয় ও কৃষিকার্যের এক বিরাট সমস্যা। প্রতি বছর নদীস্রোতের দ্বারা বাংলাদেশের বহু মূল্যবান আবাদি জমি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জমির লবনাক্ততা:
কৃষিতে লবনাক্ততা সমস্যা দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায়। এই লবনাক্ততা বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে কৃষির অন্তরায়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ:
বাংলাদেশের কৃষির আর একটি অন্যতম সমস্যা হলো বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কারণ বন্যা, ঘূর্নিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির ফলে বছরে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়।

গবাদি পশুর অভাব:
পশু শক্তিই বাংলাদেশের কৃষির মূল ভিত্তি। কিন্তু বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পশুর খুবই অভাব। আবার যা রয়েছে তার বেশীরভাগই দূর্বল প্রকৃতির, এর ফলে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়।

ভূমিহীনতা:
বাংলাদেশে কৃষিকার্যে নিয়োজিত প্রায় অর্ধেক লোকের কোনো নিজস্ব জমি নেই। তারা সকলে দিন মজুর হিসেবে কাজ করে। জমির মালিক না হওয়ায় এরা কৃষির উন্নতির জন্য সঠিক মাত্রায় পরিশ্রম করতে চায় না। আর ফলস্বরূপ জমিতে ফলন কম হয়ে থাকে।

শিক্ষার অভাব:
বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক অশিক্ষিত। কৃষি বিষয়ক শিক্ষা না থাকায় সরকারী প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কৃষির আধুনিকায়ন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

ত্রুটিপূর্ণ বাজার:
বাজার ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য বাংলাদেশের কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। দালাল, আড়তদার প্রভৃতি যারা এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে তারা ফসলের মূল্যের এক বিরাট অংশ ভোগ করে এবং কৃষকরা তাদের ন্যায্য হিস্যা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের অবস্থার তথা কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন হয় না।

অন্যান্য সমস্যা:
কৃষির অন্যান্য সমস্যার মধ্যে স্বত্ব আইনের জটিলতা, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, পন্যাগারের অভাব প্রভৃতি প্রধান।

কৃষি সমস্যার প্রতিকার: (Remedies of Agricultural Problems)

বাংলাদেশর সমস্যা সংকুল কৃষির সঠিক প্রতিকার সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। কৃষির বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি সাধন করা সম্ভব। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বনের মাধ্যমে সঠিকভাবে কৃষি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে:

ভূমি একত্রীভূতকরণ:
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত জমিগুলো একত্রিত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব। তাই প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের মাধ্যমে অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে জমি একত্রীভূতকরণ করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতি:
কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু হলে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব। তাই প্রাচীন পদ্ধতি পরিহার করে যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থা:

বর্তমানে কৃষিকাজ অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন।

কৃষিঋনের ব্যবস্থা:

সমবায় ঋনদান সমিতি ও কৃষি ব্যাংকের শাখা গ্রামে গ্রামে স্থাপন করে কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ঋন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা:

দেশে যথেষ্ট সংখ্যক কৃষিবিদ্যালয় , কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কৃষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কার্যক্রম যাতে সামগ্রিক অর্থে কৃষির ক্ষেত্রে সঠিক উন্নতি বয়ে আনতে পারে তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ ও সার প্রয়োগ:

একমাত্র ভাল বীজ ও সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব । তাই কৃষকদেরকে ভাল বীজ ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

কীটনাশক সরবরাহ ও বালাই ব্যবস্থাপনা :

পোকা-মাকড়ের আক্রমনে প্রতি বছর প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। ফসলকে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে শস্য নষ্টকারী কীটসমূহকে প্রতিরোধ করা যায়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ নিরোধ:

বন্যা, ঘূর্নিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারকে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান অবশ্যই করতে হবে। এ ছাড়াও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেড়ীবাঁধ নির্মান করে সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের হাত থেকে সেখানকার ফসলকে রক্ষা করতে হবে।

পানি নিষ্কাশন:

শীতকালে দেশের হাওড়-বাঁওড় ও বিল-ডোবা ইত্যাদিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে ব্যাপকভাবে বোরো ও ইরি ধানের চাষ করতে হবে।

বাজারের সুবন্দোব্যস্ত নিশ্চিত করা:

কৃষকগনের ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করতে হবে। এ ছাড়া দেশের সর্বত্র একই ওজন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

আদর্শ খামারের ব্যবস্থা করা:

কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য গ্রামে গ্রামে আদর্শ খামার স্থাপন করা উচিত। এ সমস্ত খামারে কিরূপে অধিক ফসল ফলায় তা দেখে গ্রামের কৃষকগণ শিক্ষা লাভ করতে পারবে। যা সামগ্রিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

উপরোল্লেখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করা হলে বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে। এই সফলতার উপর নির্ভর করে দেশের সামগ্রিক কৃষির উন্নতি।

বাংলাদেশের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অধিক।	বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ।
বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।	বাংলাদেশের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশের একর প্রতি ফসল উৎপাদন খুবই কম। বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অধিক। এদেশের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এদেশের কৃষিকার্যে জমির খন্ড-বিখন্ডতা একটি মারাত্মক সমস্যা। মৌসুমি বায়ুর তারতম্যের কারণে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত আমাদের দেশের কৃষির অন্যতম প্রধান বাঁধা। বাংলাদেশের কৃষিকে "মৌসুমি বায়ুর জুয়াখেলা" বলা হয়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে শস্য নষ্টকারী কীটসমূহকে প্রতিরোধ করা যায়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. শূন্যস্থান পূরন করুনঃ

১.১ জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাবার ফলে দেশের ------ উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
১.২ বাংলাদেশের কৃষিকাজে জমির ------ একটি মারত্মক সমস্যা।
১.৩ বাংলাদেশের কৃষি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ------ উপর নির্ভরশীল।
১.৪ দেশের কৃষিতে শীতকালে ------ ব্যবস্থার দারুণ অভাব রয়েছে।
১.৫ কৃষিতে লবনাক্ততার সমস্যা দেশের ------- অঞ্চলে দেখা যায়।
১.৬ একমাত্র ------- ও------ প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের কৃষি জমিতে একর প্রতি ফসলের উৎপাদন কেমন?
ক) খুব বেশী খ) বেশী
গ) মাঝারী ঘ) খুবই কম

২.২ বাংলাদেশের কৃষি জমিতে প্রাকৃতিক উর্বরা শক্তি কেমন?
ক) হ্রাস পাচ্ছে খ) বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ) অপরিবর্তিত আছে ঘ) এর কোনটিই নয়

২.৩ বাংলাদেশের কৃষিকে মৌসুমি বায়ুর জুয়া খেলা বলা হয় কেন?
ক) বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরতা খ) তাপমাত্রার উপর নির্ভরতা
গ) বায়ুর উপর নির্ভরতা ঘ) আর্দ্রতার উপর নির্ভরতা

২.৪ দেশের কৃষিতে লবনাক্ততা সমস্যা কোন অঞ্চলে দেখা যায়?
ক) নদী তীরবর্তী এলাকায় খ) পাহাড়ী এলাকায়
গ) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঘ) সোপান এলাকায়

২.৫ ভাল বীজ ও সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উৎপাদন শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব?
ক) ১০ থেকে ১৫ ভাগ খ) ১৫ থেকে ২৫ ভাগ
গ) ২৫ থেকে ৩৫ ভাগ ঘ) ৪০ থেকে ৫০ ভাগ

২.৬ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কি?
ক) ক্ষতিকর কীট প্রতিরোধক ব্যবস্থা খ) উপকারী কীট প্রতিরোধক ব্যবস্থা
গ) ভাল বীজ সরবরাহ ঘ) ভালমানের সার সরবরাহ

২.৭ পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কোন ফসল ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব?
ক) আউস ধান খ) আমন ধান
গ) বোরো ধান ঘ) কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের কৃষি জমি গুলোর উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে কেন?
২. বাংলাদেশের কৃষিকে মৌসুমী বায়ুর জুয়াখেলা বলা হয় কেন?
৩. বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় কৃষিতে লবনাক্ততা সমস্যা দেখা যাচ্ছে?
৪. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কি?
৫. পানি নিষ্কাশনের কারণে কোন কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের কৃষিতে যেসব সমস্যা রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক এইসব সমস্যা কিভাবে সমাধান বা প্রতিকার করা যায় তা সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.৪

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ
(Natural Resources of Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশে কি কি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ রয়েছে তা সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে সহজ কথায় প্রাকৃতিক সম্পদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান। এই সৃষ্টিতে মানুষ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃতিক সম্পদের সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, মৎস্য, বনভূমি, পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, সাগর-হ্রদ ও জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। নিম্নে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ ও তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মৃত্তিকাঃ

মৃত্তিকা প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। মৃত্তিকার উর্বরা শক্তির উপর কৃষির উন্নতি সম্পুর্ণ নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মৃত্তিকা উর্বর বলে এখানে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়। এটেল, দোঁআশ, কাদা, বালি মাটি প্রভৃতি নানা ধরনের ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। কৃষিজাত দ্রব্য দেশের জনগনের খাদ্যের সংস্থান এবং শিল্পের সহায়তা করে।

জলবায়ুঃ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত, তাপ ইত্যাদি জলবায়ুর প্রধান নিয়ামক। তাই প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর কৃষি কাজ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। জলবায়ুও প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। তাই জলবায়ুর উপর দেশের কৃষি তথা সামগ্রিক উন্নতি নির্ভশীল।

খনিজ সম্পদঃ

স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয় বলে খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। ভারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রচুর খনিজ সম্পদের প্রয়োজন। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতির যন্ত্রপাতিও ভারী শিল্প সরবরাহ করে থাকে। অতএব ভারী শিল্পের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই খনিজ সম্পদের ওপর ভারী শিল্প নির্ভর করে বিধায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সঞ্চিত খনিজ সম্পদগুলো হলো- কয়লা, খনিজ তেল, চুনাপাথর, চীনামাটি, তামা, কঠিন শিলা, সিলিকাবালি, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি। তাই সর্বপরি খনিজ সম্পদের সঠিক সদ্ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

মৎস্য সম্পদঃ

মৎস্যও প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। নদী মাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল এবং সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। মাছ বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য। প্রচুর প্রোটিন থাকে এ সকল মৎস্যে। আবার মৎস্য রপ্তানীকরে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। আবার এই মৎস্য থেকে মৎস্য তেল, সার, সিরিশ ইত্যাদি তৈরী হয়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৪২৪৮২ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি করে ১৬৭৩.১৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বনজ সম্পদঃ

বনজ সম্পদও প্রাকৃতিক সম্পদ। বন হতেই শিল্পের নানা প্রকার কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের কাগজ, রেশম, দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল বনভূমি থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া বন দেশের বৃষ্টিপাত

নিয়ন্ত্রন করে এবং বন্যা ও ঝড়ের তীব্রতা আংশিক রোধ করে। গাছের ঝরাপাতা ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। দেশের বনজসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে।

পাহাড়-পর্বতঃ

পাহাড়-পর্বতও প্রাকৃতিক সম্পদরূপে গন্য হয়। কারণ পাহাড়-পর্বতের প্রভাবে দেশে বৃষ্টিপাত হয় এবং নানা ধরনের ফসল জন্মে। এছাড়া পাহাড় -পর্বতে বহু মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে এবং এদের ঢালু ভূমি চা, রাবার ও আনারস চাষের জন্যে আদর্শ স্থান। তাই পাহাড় -পর্বত প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সর্বপরি পাহাড়-পর্বতকে ব্যাপকভাবে উজার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।

নদ-নদী, জলাশয় ও সমুদ্রঃ

নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, সমুদ্র প্রভৃতিও প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। নদ-নদীর পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কৃষিকার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো মৎস্য সম্পদের উৎস। বাংলাদেশের নদীগুলো অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ও পরিবহনের প্রধান উপায় হিসাবে কাজ করে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে নদ-নদী, জলাশয়, সমুদ্র ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সর্বপরি নদ-নদী, জলাশয়, সমুদ্রকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল।	প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান।	বন দেশের বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, মৎস্য, বনভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-হ্রদ, জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর কৃষির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ভারী শিল্পের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া বন দেশের বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রন করে এবং বন্যা ও ঝড়ের তীব্রতা আংশিক রোধ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ মৃত্তিকা ---- সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

১.২ প্রাকৃতিক সম্পদ --- দান।

১.৩ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের --- অগ্রগতি নির্ভরশীল।

১.৪ স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয় বলে খনিজ সম্পদ ---- সম্পদের অন্তর্ভূক্ত।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কি ধরণের?

ক) মনুষ্য সৃষ্ট খ) প্রকৃতির সৃষ্ট

গ) মনুষ্য ও প্রকৃতি উভয়ের সৃষ্ট ঘ) কোনটিই নয়।

২.২ মৃত্তিকার উর্বরা শক্তির উপর কিসের উন্নতি নির্ভরশীল?

ক) কৃষির খ) পাহাড়-পর্বতের

গ) মৎস্য সমূহের ঘ) কোনটিই নয়

২.৩ বাংলাদেশের মৃত্তিকা কি ধরণের?

ক) উর্বর প্রকৃতির খ) অনুর্বর প্রকৃতির

গ) উভয়ই ঘ) কোনটিই নয়।

২.৪ বন দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি পরিমাণ রোধ করে?

ক) সম্পূর্ণরূপে খ) আংশিকরূপে

গ) রোধ করেনা ঘ) কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ কি কি?

২. প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে কিনা?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ উল্লেখপূর্বক বিবরণ প্রদান করুন।

২. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.৫

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ

(Major Mineral Resources in Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশে কি কি খনিজ সম্পদ আছে তার সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন;
- বাংলাদেশের খনিজ ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানোর ফলে জায়গাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশের প্রধান খনিজদ্রব্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদনকারী এলাকাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের তালিকার মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দিক বিবেচনায় আনলে বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত নয়। আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় খনিজ সম্পদের পরিমান কম থাকার কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে যে সকল খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে তার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

কয়লাঃ

কয়লাকে শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালনা করার জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জ্বালানী হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা সম্পদে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ তত উন্নত নয়। আমাদের দেশের ফরিদপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিল , খুলনার কোলাবিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

খনিজ তেলঃ

বিশেষজ্ঞগনের ধারনা অনুযায়ী উল্লেখকরা যায় যে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল তোলা হচ্ছে। এ অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত। এ ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়।

চুনাপাথরঃ

সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার ভাঙ্গারঘাট, বাগলিবাজার, লালঘাট এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়। রাজশাহী বিভাগে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও জয়পুরহাটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। সিমেন্টের জন্য কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ□াস, বি□চিং পাউডার, সাবান, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহার হয়ে থাকে।

চীনামাটিঃ

রাজশাহী, নওগাঁ ও ময়মনসিংহে চীনামাটি পাওয়া গেছে। এটি তৈজসপত্র তৈরীতে এবং বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারী সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

তামাঃ

রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সঙ্গে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কঠিন শিলাঃ

রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু ও বাঁধ নির্মান এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রভৃতিকাজে কঠিনশিলা ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুরে এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের তথ্য মতে, এই

স্থান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উত্তোলন করা যাবে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়া থেকে শিলা উত্তোলন করার জন্য বৈদেশিক সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সিলিকাবালিঃ

সিলিকাবালি সাধারনত কাঁচ নির্মানে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রং, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি তৈরিতেও সিলিকাবালি ব্যবহৃত হয়। সিলেট জেলার নয়াপাড়া, শাহজীবাজার, কুলাউড়া, শেরপুর জেলার বালিজুরি, চট্টগ্রাম এর দোহাজারীতে সিলিকাবালির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট সিলিকাবালি উৎপাদিত হয়ে থাকে।

পারমানবিক খনিজ পদার্থঃ

পারমানবিক খনিজ পদার্থ সাধারনত ভারি ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর খনিজ বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। পারমানবিক খনিজ পদার্থগুলো হল জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, লিউকক্সেন প্রভৃতি। এ খনিজ সংগ্রহের জন্য অষ্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গন্ধকঃ

গন্ধক সাধারনত রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বারুদ, কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধ তৈরী, এসিড, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, দিয়াশলাই, আতশবাজি প্রভৃতি তৈরীতে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের তুলনায় খনিজ সম্পদে পিছিয়ে রয়েছে। তবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ রয়েছে এ দেশ। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ন জ্বালানী সম্পদ, যা সমগ্র দেশের মোট জ্বালানী ব্যবহারের শতকরা ৭০ ভাগ চাহিদা পূরণ করে থাকে। ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ পর্যন্ত দেশের আবিস্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২২ টি। বর্তমানে ১২টি ক্ষেত্রের ৫৪ টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। নিম্নের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ সারনীতে দেয়া হলোঃ

সারণী ঃ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)

সাল	উৎপাদনের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)
২০০১-০২	৩৯২
১৯৯৮--৯৯	৩০৮
১৯৯৭-৯৮	

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩। (পৃষ্ঠা - ৮৫)

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ২৪.৭৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বাংলাদেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো হল সিলেট, ছাতক, রশীদপুর, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা, বাখরাবাদ, তিতাস, বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া, কামতা, সেমুতাং. ফেনী, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, মেঘনা, নরসিংদী, শাহবাজপুর, সাঙ্গু, বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার প্রভৃতি।

সর্বোপরি বলা যায় যে, খনিজ সম্পদগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যদি উত্তোলন ও এর সদ্ব্যাবহার করা যায় তবে তা দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

নিম্নে বাংলাদেশের খনিজ ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

সারণীঃ ৩.৫.২ : বাংলাদেশের খনিজ ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান

মানচিত্র-৩.৫.১

সিমেন্টের জন্য কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।	প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ।
দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে।	বাংলাদেশের সমুদ্র উপকুল অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে বলে ধারনা করা হয়।
অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের শোধনাগারে প্রক্রিয়া জাত করা হয়।	

পাঠ সংক্ষেপঃ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে যেসব খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে তা হলো- কয়লা, খনিজ তেল, চুনাপাথর, চীনামাটি, তামা, কঠিনশিলা, সিলিকা বালি, পারমাণবিক খনিজ পদার্থ, গন্ধক, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। সিলেট, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার,ভোলা প্রভৃতি জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, নঁওগা এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে। সিমেন্টের জন্য কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক খনিজ পদার্থ সাধারণত ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মুল্যায়নঃ ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের প্রাপ্ত কয়লা তত বেশী ---------- নয়।

১.২ ধারণা করা যাচ্ছে বাংলাদেশের ---------- অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে।

১.৩ সিলেটের হরিপুরের তেল ক্ষেত্র থেকে ---------- উত্তোলন করা হয়।

১.৪ দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় ---------- সন্ধান পাওয়া গেছে।

১.৫ কক্সবাজার জেলার ---------- দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে।

১.৬ বাংলাদেশে মোট আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্য ---------- টি।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বিটুমিনাস কি জাতীয় খনিজ পদার্থ?

ক) কয়লা খ) চুনাপাথর

গ) কঠিন শিলা ঘ) চীনামাটি

২.২ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণ খনিজ তেল মজুদ আছে বলে ধারণা করা হয়?

ক) সোপান এলাকা খ) টারশিয়ারী পাহাড় এলাকা

গ) প□াবণ সমভূমি এলাকা ঘ) সমুদ্র উপকূল এলাকা

২.৩ চুনাপাথর থেকে নিচের কোন জিনিষটি তৈরী করা যায় না?

ক) গ□াস খ) বি□চিং পাউডার

গ) স্যানিটারী সরঞ্জাম ঘ) সাবান

২.৪ পারমানবিক খনিজ পদার্থ নীচের কোন স্থানে পাওয়া যায় না?

ক) কুতুবদিয়া খ) টেকনাফ

গ) কুমিল্লা ঘ) কক্সবাজার

২.৫ নীচের কোন দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে?

ক) কুতুবদিয়া খ) ভোলা

গ) হাতিয়া ঘ) সন্দ্বীপ

২.৬ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানী ব্যবহারে কত শতাংশ চাহিদা পূরণ করছে?

ক) ৫০ ভাগ খ) ৬০ ভাগ

গ) ৭০ ভাগ ঘ) ৮০ ভাগ

২.৭ বাংলাদেশে কয়টি কুপ থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে?

ক) ৫১ টি খ) ৫২ টি

গ) ৫৩ টি ঘ) ৫৪ টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহ কি কি?

২. বাংলাদেশে কঠিন শিলা কোথায় পাওয়া গেছে?

৩. বাংলাদেশে কি পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত আছে?

৪. বাংলাদেশের কোথায় কোথায় প্রাকৃতিক গ্যাস আবিস্কৃত হয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদসমূহের ভৌগোলিক বন্টন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.৬

বনজ সম্পদ

(Forest Resources)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি -

- ◆ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ তুলনা করতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশের মানচিত্রে বনভুমির অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশের বনভূমিকে যে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় তা বুঝতে পারবেন;
- ◆ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের অবদান সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ◆ বাংলাদেশের বৃক্ষরোপন ও বন সংরক্ষণ বিষয়ে করণীয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সাধারণত বৃক্ষরাজির সমারোহকে বনভূমি বা অরণ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায় তাকে বনজ সম্পদ বলে। একটি দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশের মোট জমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমান হলো প্রায় ২৫,০০০ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ ৬২ লক্ষ একর বনভূমি রয়েছে বাংলাদেশে যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা প্রায় ২ ভাগ এই খাতে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের বনভূমি প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারনে গৃহনির্মান সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে গাছপালার অধিক ব্যবহারের ফলে বনভূমির পরিমান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বনভূমির পরিমান নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো:

সারণী: ৩.৬.১: মোট ভূ-ভাগের শতকরা হার হিসেবে অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা (বাংলাদেশের বনভূমি)

দেশ	বনভূমি (%)	দেশ	বনভূমি (%)
ফিনল্যান্ড	৭৪	কানাডা	৪৫
মায়ানমার	৬৭	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩৪
জাপান	৬৩	ভারত	২২
সুইডেন	৫৫	বাংলাদেশ	১৭
রাশিয়া	৫১	-	-

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩ পৃ: ৬৩

বিভিন্ন প্রকার বনভূমি:

জলবায়ু ও মৃত্তিকার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন বনাঞ্চল পর্যালোচনার সাপেক্ষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পর্নমোচী বৃক্ষের অন্তর্গত। তবে এদেশে সরল বর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি ও পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। যার ফলে এদেশের বনভূমির বন্টন অনেকটা অহয় ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। যার ফলে এদেশের বনভূমির বন্টন অনেকটা ক্রান্তীয় জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামান্য উচ্চভূমি ব্যতিত সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ন বৈচিত্রহীন সমভূমি। উচ্চভূমির পরিমান সীমিত হলেও দেশের অধিকাংশ বনভূমি এ উচ্চ ভূমিতেই অবস্থিত।

নিম্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমির বিবরণ দেয়া হলোঃ

মাটি ও জলবায়ু জনিত পার্থক্য বিরাজমান থাকার কারণে বাংলাদেশের সর্বত্র এক ধরনের উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায় না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ জন্মে। নিম্নে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণী বিভাগ করা হলোঃ

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি।

২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি।
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলো:

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি

যে সকল গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না এবং পাতাগুলো চিরসবুজ থাকে তাদেরকে চিরহরিৎ গাছ কিন্তু যে সকল পাতাগুলো ঋতু বিশেষে একসঙ্গে ঝরে পড়ে সেগুলোকে পাতাঝরা বৃক্ষ বলা হয়। বাংলাদেশে এ দুই শ্রেণীর বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও সুন্দরবনের প্রায় সব অংশে এবং সিলেট জেলার কিছু অংশে এবং চট্টগ্রামে এ বনভূমি বিস্তৃত। এর আয়তন ১৪,১০২ বর্গ কিলোমিটার। অতিবৃষ্টির জন্য এ সব বনভূমিতে চিরহরিৎ বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছে।
চিরহরিৎ গাছের মধ্যে চাপালিশ, ময়না, তেলসুর ইত্যাদি এ বনে রয়েছে। পাতাঝরার মধ্যে এ বনভূমিতে রয়েছে গামার, শিমুল, কড়ই, সেগুন, জারুল প্রভৃতি গাছ । এ ছাড়া বাঁশ, বেত, মোম, মধু ও ঔষধি গাছ ও এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি:

ক্রান্তীয় অঞ্চলে যে সব গাছের পাতা বছরে একবার সম্পূর্ণ ঝরে যায় সেগুলোকে ক্রান্তীয় পাতাঝরা উদ্ভিদ বলা হয়। বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিন কালের সোপান সমূহে এ বনভূমি রয়েছে। এ জাতীয় বনভূমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ও গাজীপুর, রংপুর ও দিনাজপুরে দেখা যায়। এ বনভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার বনভূমিকে মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভুমি এবং
২. দিনাজপুর জেলার বনভূমিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি বলা হয়। উভয় অঞ্চলের বনভূমিতে শাল গাছের প্রাধান্য রয়েছে। মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমির গাছগুলো স্থানীয়ভাবে গজারী নামে পরিচিত। এ বনভূমিতে কড়ই, হিজল, বহেরা, হরিতকী, কাঁঠাল, নিম প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমির শতকরা ৯৫ ভাগ গাছই শাল।

স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন:

এ বনভূমির আয়তন ৬,৪৭৪ বর্গ কি.মি.। খুলনা , সাতক্ষীরা, বাগের হাট ও বরগুনা জেলায় এ বনাঞ্চল অবস্থিত। সুন্দরী ও গরান এ বনভূমির প্রধান গাছ। অন্যান্য গাছের মধ্যে গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন প্রভৃতি প্রধান। সুন্দরবনে প্রচুর গোলপাতা জন্মে।

বনজ সম্পদের গুরুত্ব:

বনজ সম্পদ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের পরিমান সীমিত তবুও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনভূমির ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের বনভূমির দেশের উন্নয়নে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫% অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের ভূমিকা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. পন্য সামগ্রী সংগ্রহ:

মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এ ছাড়া জীবজন্তুর চামড়া ও ভেষজ দ্রব্য বনভূমি থেকে আহরিত হয়ে থাকে।

২. নির্মান সামগ্রীর উপকরণ সমূহ:

মানুষ বনভূমি থেকে তার ঘরবাড়ি ও আসবাব পত্র নির্মানের জন্য কাঠ, বাঁশ , বেত, প্রভৃতি যাবতীয় উপকরন সংগ্রহ করে। বাড়িঘর ও আসবাব পত্র নির্মানের জন্য মানুষ বনভূমি থেকে সাল, সেগুন, মেহগনি, গর্জন, গামার, কড়ই গাছের মূল্যবান কাঠ সংগ্রহ করে।

৩. কৃষি উন্নয়ন:

এ দেশের বনভূমি দেশের আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক। এ ছাড়া বনভূমি মাটির ক্ষয়রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করে।

মানচিত্র-৩.৬.১

৪. শিল্পের উন্নতি:

বাংলাদেশে কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, ফাইবার বোর্ড, খেলনার সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে। কর্নফুলী কাগজকল, খুলনা নিউজ প্রিন্ট কারখানা বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৫. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:

বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনের স্লি- পার, মোটরগাড়ি , নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ প্রভৃতির কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রাস্তার পুল প্রভৃতি নির্মান করা হয়।

৬. সরকারের আয়ের উৎস:

বনজ সম্পদের সরকারের আয়ের একটি উৎস। যেমন: বনজ সম্পদ বিক্রি ও এর উপর কর ধার্য করে সরকার রাজস্ব আয় বাড়িয়ে থাকে।

৭. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:

বনের বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, দাঁত, শিং, পশম এবং জীবন্ত বন্য জন্তু রপ্তানি করে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বাংলাদেশের বৃক্ষরোপন ও বনসংরক্ষণ:

বনায়ন হচ্ছে মানুষের তৈরী বন। প্রাকৃতিক বন বিভিন্ন কারণে নিঃশেষ হলে বা হওয়ার উপক্রম হলে বনায়নের প্রয়োজন হয়। পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচী শুরু করে। দেশে প্রধানত সরকারী পর্যায়েই বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃক্ষরোপন এবং বনসংরক্ষণের প্রতি সচেষ্ট হওয়া দরকার। বনভূমির পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকায় এর বৃদ্ধি সাধন করা প্রয়োজন। এ জন্য দেশের পানি সেচযোগ্য কিছু অংশে এবং পতিত জমিতে বৃক্ষাদির চারা রোপন করে বনভূমি সৃষ্টি করা দরকার। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশের বৃক্ষরোপনের অবস্থা তুলে ধরা হলো:

সারণী: ৩.৬.২ :বৃক্ষরোপনের পরিমান (একরে)

শ্রেণী বিভাগ	১৯৯১-৯২	১৯৯২৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
উপকূলীয় বনভূমি/সুন্দরবন	৮৮১০	১০৬৮৭	১২৩২৮	৯৫০৯	৬৭৪৩	৬৯১৬
পাহাড়ী বনভূমি	৮৯৬৫	১০৪৬৫	১০৪৭৫	১০৪৭২	১০৩০১	১২৭৩৩
শ্রেণী বহির্ভুত বনভূমি	-	৩৩৩০	১৯২১৫	১২৭৮০	৩২৯০	৩৯৩২
সামাজিক বনভূমি	-					
ক. কাঠ নির্ভর	৭০৫০	৯৩৯০	১১৪২৬	৬৮৬৯	৩৩	১২০২
খ. কৃষি বনভূমি	১১০৩	১৮৫৩	১৯৭৭	২৫৫৮	২৪৭	৪৩৯০
গ. রাস্তা, রেল, বাধ প্রভৃতি নির্মাণ	৪৩৮	৩৫৭৮	৫৪৭৬	৩৯৩৩	১৬৬৬	৩৩৩০
ঘ. প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত বনভূমি	-	১৮	২৯	৩২	৮	৪০

উৎস: বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯, ১৯৯৭ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা, (পরিবেশ পরিসংখ্যান)। এবং বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট, ২০০১, সংখ্যা-২ (তথ্য সারণী নির্ভর), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

বনভূমির সম্প্রসারন ও এর উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। তাই আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বনজ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবে। নিম্নে বনজ সম্পদ উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ মালা দেয়া হলো:

১. বনজ সম্পদের সংরক্ষন ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আরো জোরদার করতে হবে।
২. ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনাঞ্চল পূর্ণবনায়ন করতে হবে এবং অপরিকল্পিতভাবে বন নিধন বন্ধ করতে হবে।
৩. বনভূমির মূল্যবান গাছ অপরিপক্ক অবস্থায় যাতে না কেটে ফেলা হয় তার ব্যবস্থা করা।

৪. পাহাড়ের ঢালে, সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে।
৫. পরিকল্পিত উপায়ে মূল্যবান বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
৬. বন গবেষণা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করা।
৭. বন্য প্রাণী রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
৮. সর্বোপরি বনভূমির অপব্যবহার ও অপচয় রোধ করতে হবে।

দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বনজসম্পদের ঘাটতি পূরণ; কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করণ, জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সার্বিক বন উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ লক্ষে ২০ বছর ব্যাপী (১৯৯৫ - ২০১৫) বন মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। বন মহাপরিকল্পনার তিনটি মূল অঙ্গ যথা- উৎপাদনমুখী, অংশীদারিত্বমূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির জোরদার করণ কর্মসূচী।

যেকোন দেশের মোট জমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।	বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।
বনজ সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।	বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পর্ণমোচী বৃক্ষের অন্তর্গত।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় তাকে বনজ সম্পদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। একটি দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের পূর্বশর্থ হচেছ দেশের মোট জমির ২৫ শতাংশ বনভূমি। বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বর্ণমোচী বৃক্ষের অন্তগর্ত। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি
২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।
বনজসম্পদ যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জোরদার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে; সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং নদী-তীরবর্তী এলাকায় নতুন বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে।

পাঠোত্তর মুল্যায়নঃ ৩.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরন করুনঃ

১.১ একটি দেশে কমপক্ষে ------ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
১.২ বাংলাদেশে মোট আয়তনের ------ ভাগ বনভূমি রয়েছে।
১.৩ ------ বৃদ্ধিজনিত কারণে বনভূমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।
১.৪ বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় ------ বৃক্ষের অন্তর্গত।
১.৫ সুন্দরবনে প্রচুর ------ জন্মে।
১.৬ বনভূমি মাটির ------ প্রতিরোধ করে।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের মোট আয়তনের কতভাগ বনভূমি?
ক) প্রায় ১৫ ভাগ খ) প্রায় ১৭ ভাগ
গ) প্রায় ২০ ভাগ ঘ) প্রায় ২৫ ভাগ

২.২ যে সকল গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না এবং সবুজ থাকে তাদেরকে কি বৃক্ষ বলা হয়?
ক) চিরহরিৎ বৃক্ষ খ) পাতাঝরা বৃক্ষ
গ) স্রোতজ বৃক্ষ ঘ) পত্রপতনশীল বৃক্ষ

২.৩ ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভুমি কোথায় দেখা যায়?
ক) টারশিয়ারী পাহাড় এলাকায় খ) প- াইষ্টোসিন চত্বর এলাকায়
গ) নোনাভূমি এলাকায় ঘ) প াবন সমভূমি এলাকায়

২.৪ ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমির প্রধান বৃক্ষ কোনটি?
ক) চাপালিশ খ) সুন্দরী
গ) শাল ঘ) ময়না

২.৫ কর্ণফুলী কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কি?
ক) বেত খ) সেগুন কাঠ
গ) বাঁশ ঘ) সুন্দরী কাঠ

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বনভূমি কাকে বলে?
২. বাংলাদেশের স্রোতজ বনভূমি কোথায় দেখা যায়?
৩. বনজ সম্পদসমূহ কি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?
৪. বনজ সম্পদ উন্নয়নে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণী বিভাগ করুন।
২. বাংলাদেশের বনভূমির উন্নয়নে আপনার মতামত সমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

পাঠ-৩.৭

মৎস্য সম্পদ
(Fisheries)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি -

- বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন ও রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে সৎস্য সম্পদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারনা পাবেন;
- বাংলাদেশের ধৃত মৎস্যের পরিমাণ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাবেন; এবং
- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ পৃথিবীর কোন কোন দেশে রপ্তানী হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য আমরা মাছের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পূর্বে এদেশে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যেত এবং এটিই প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতো । কিন্তু বর্তমানে জলাভূমি কমে যাওয়ায় মাছের অভাবহেতু 'মাথাপিছু' ব্যবহার খুবই কমে গেছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান হল শতকরা প্রায় ৫ ভাগ এবং মোট রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান প্রায় ৫.১২ ভাগ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

খাদ্য হিসেবে মৎস্য:

মৎস্য বাংলাদেশের অধিবাসীদের একটি উপাদেয় খাদ্য। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে খনিজ আমিষের প্রায় ৬০% আসে মাছ থেকে। বর্তমানে দৈনিক গড় মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২৮ গ্রাম, যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম। আমাদের খাদ্য তালিকায় যেখানে প্রোটিন এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব রয়েছে সেখানে মৎস্য সেই অভাব বহুলাংশে মেটাতে পারে।

জীবিকা নির্বাহের উপায়:

নদীবহুল বাংলাদেশের সর্বত্র অসংখ্য ছোট বড়, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হাওড়, কৃত্রিম জলাশয় রয়েছে। এ সব জলাশয় বিভিন্ন ধরনের মৎস্যে পরিপূর্ণ। এসব মৎস্য শিকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ১২ লাখ ৫২ হাজার লোক জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া আরো অনেক লোক পরোক্ষভাবে মৎস্য শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:

মৎস্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। রপ্তানীকৃত মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছের পরিমানই বেশী। জাতীয় আয়ের প্রায় ৫.৩% এবং দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬% আসে মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি থেকে। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ৩৮৯৮৮ মেট্রিকটন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তনি করে ২০৩২.৭৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৪২৪৮২ মেট্রিকটন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি করে ১৬৭৩.১৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

শিল্পের উপকরণ:

মাছের চর্ম, হাড়, কাঁটা, চর্বি ইত্যাদি কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হাঙ্গর, কচ্ছপ হতে আহরিত তেল দ্বারা নানা ধরনের ওষুধ, বার্নিশ, গ্লিসারিন, সাবান ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। আবার চামড়া প্রক্রিয়াজাত করনেও এসব মৎস্য তেল ব্যবহৃত হয়।

আনুষাঙ্গিক শিল্পের উন্নতি:

মৎস্য শিল্পকে কেন্দ্র করে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পূরক শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন- নৌকা ও জাল তৈরীর কারখানা, বরফ ও লবন উৎপাদন কারখানা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রসমূহ:

বাংলাদেশের নদী-নালা, খালবিল, পুকুর-ডোবা, হাওড়-বাঁওড়, নদীর মোহনা, উপকূল ও সমুদ্র অঞ্চল ইত্যাদি মৎস্যের প্রধান ক্ষেত্র। এছাড়া কৃত্রিম জলাশয়, ধান ও পাট ক্ষেতও মৎস্যের ক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত। বাংলাদেশের এ সকল মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ২৫০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪.৪ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ১১ লাখ ১২হাজার হেক্টর পরিমান জমিতে মৎস্য ক্ষেত্র রয়েছে। এসব মৎস্য ক্ষেত্র থেকে ধৃত মৎস্যের পরিমান প্রায় ৮ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। মৎস্যের উৎপাদন ক্ষেত্রের অবস্থান অনুযায়ী তাদের ২টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক. অভ্যন্তরীন মৎস্য ক্ষেত্র ও
খ. সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র।

সারণীঃ ৩.৭.১ : বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রের পরিমান (হেক্টর হিসেবে)

মৎস্য ক্ষেত্রের প্রকার	পরিমাণ (হেক্টর হিসেবে)
১. পুকুর এবং ডোবা	৬৯,৪৫৫.৪২
২. খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়	২,৯৩০০২.৮০
৩. নদী-নালা	৮,৩০,১২০.৬৪
৪. কর্নফুলী কাপ্তাই হ্রদ	৯০,৬৫২.৮০
৫. নদীর মোহনা, সুন্দরবন অঞ্চল	১৮,২৯২.০০
৬. ধানক্ষেত ও পাট ক্ষেত (৪-৫ মাসের বেশি যে ক্ষেত্রে পানি থাকে)	১০,১১,৭৫০.০০
৭. উপকূল ও সমুদ্র অঞ্চল	১০,১১,৭৫০.০০
সর্বমোট-	১,১১,১২,৫৮৫.৮৬

উৎস: Directorate of Fisheries.

ক. অভ্যন্তরীন বা মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র:

বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, হাওড়-বাঁওড়, ধান ও পাট ক্ষেত এবং নদীর মোহনা ইত্যাদিকে অভ্যন্তরীন মৎস্য ক্ষেত্র বলে। এ সকল অঞ্চলের ধৃত মৎস্যকে অভ্যন্তরীন বা মিঠা পানির মৎস্য বলা হয়। অভ্যন্তরীন মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মৎস্যের মধ্যে রয়েছে ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, আইড়, বোয়াল, পাঙ্গাশ, শোল, কই, মাগুর, শিং, চিংড়ি, পাবদা, সরপুটি ইত্যাদি।

খ. সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র:

মৎস্য শিল্পে উন্নত না হলেও বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ । দেশের বিভিন্ন জলাশয় নানা ধরনের মাছ ও মাছ জাতীয় সম্পদে পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলাশয় হতে প্রচুর মৎস্য ধৃত হলেও , সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের পরিমান খুবই কম। ১৯৮৪-১৯৯৮ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মোট ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ৬৩% থেকে কমে গিয়ে ৪৬% দাঁড়িয়েছে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রুপচাঁদা, লইট্যা, ছুড়ি, সুরমা প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন এলাকায় সমন্বিত মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারী পর্যায়ে ১১২ টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৬৬৭ টি সহ সর্বমোট ৭৭৯ টি মৎস্য হ্যাচারি ও খামার রয়েছে। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় ১৭০০ টি মৎস্য খামার

আছে। নিম্নে অবদান অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মৎস্য সম্পদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৯৯/২০০০ থেকে ২০০২/০৩) তুলে ধরা হলো।

সারণী : ৩.৭.২: বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ঃ

জলাশয়ের বিবরণঃ	আয়তন (লক্ষ হে:)	৯৯/২০০০	২০০০/০১	২০০১/০২	২০০২/০৩
১। অভ্যন্তরীন জলাশয় ক. মুক্ত জলাশয়		উৎপাদন (মে.টন)	উৎপাদন (মে.টন)	উৎপাদন (মে.টন)	উৎপাদন (মে.টন)
নদী ও নদী মোহনা	১০.৩২	১.৫৪	১.৫০	১.৬৫	১.৭৯
সুন্দরবন	---	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪
ডবল	১.১৪	০.৭৩	০.৭৫	০.৮০	০.৮৯
কাপ্তাইলেক	০.৬৯	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮৯
প্লাবনভূমি	২৮.৩৩	৪.২৫	৪.৪৫	৪.৫০	৫.০১
মোট মুক্ত জলাশয়	৪০.৪৭	৬.৭০	৬.৮৯	৭.১৬	৭.৯২
খ. বদ্ধ জলাশয় পুকুর	২.৪২	৫.৬১	৬.১৬	৬.৫০	৭.২৩
বাওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৫
চিংড়ি খামার	১.৪১	০.৯২	০.৯৩	১.০০	১.১১
মোট বদ্ধ জলাশয়	৩.৮৮	৬.৫৭	৭.১৩	৭.৫৫	৮.৪০
মোট অভ্যন্তরীন	৪৪.৩৬	১৩.২৮	১৪.০২	১৪.৭০	১৬.৩২
২। সামুদ্রিক জলাশয় ক. বণিজ্যিক ভিতে	০.৪৮	০.১৬	০.২৪	০.৩০	০.৩৩
খ. আর্টিসনাল ভিভিতে	---	৩.১৮	৩.৫৫	৩.৭০	৪.১২
মোট সামুদ্রিক	---	৩.৩৪	৩.৭৯	৪.০০	৪.৪৫
দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন	১৬.৬১	১৬.৬১	১৭.৮১	১৮.৭০	২০.৭৭

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রনালয়।

মৎস্যের বাণিজ্যঃ

দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ প্রচুর মৎস্য বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, ইলিশ প্রভৃতি প্রধান। এ সকল মাছ তাজা অবস্থায় বরফ দিয়ে এবং শুকনা অবস্থায় লবন দিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ২০০১-২০০২ সালে বাংলাদেশ থেকে ১৬৭৩.১৪ কোটি টাকা মূল্যের ৪২,৪৮২ মেট্রিক টন মৎস্য বিশ্ববাজারে রপ্তানী হয়।

আমদানী কারক দেশসমূহঃ

যে সকল দেশ বাংলাদেশ হতে মাছ ও মাছ জাতীয় পন্য আমদানী করে তাদের মধ্যে ভারত, চীন, জাপান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রধান। নিম্নের সারণীতে মৎস্যের রপ্তানী বাণিজ্য দেয়া হলো:

সারণী : ৩.৭.৩: মৎস্যের রপ্তানী বানিজ্য

সাল	রপ্তানীকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য (মেট্রিক টন)	মূল্য (কোটি টাকা হিসেবে)
২০০০-২০০১	৩৮,৯৮৮	২০৩২.৭৫
২০০১-২০০২	৪২,৪৮২	১৬৭৩.১৪

উৎস: অর্থনৈতিক জরিপ, ২০০১-২০০২।

পরের পাতায় মৎস্য সম্পদের অবস্থান মানচিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

মানচিত্র-৩.৭.১

বাংলাদেশের মৎস্য শিল্পঃ

মৎস্য চাষ, মৎস্য ধরা, মৎস্য সংরক্ষণ, মৎস্য বাজারজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য হতে কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপকে মৎস্য শিল্প বলা হয়। বাংলাদেশ প্রচুর মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও এ শিল্পে অনুন্নত। সম্প্রতি সরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক শিল্প হিসেবে খাদ্য ও প্রোটিন সরবরাহ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল যোগান, বহু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।	মৎস্য বিশেষত চিংড়ী মাছ রপ্তানী করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।	বাংলাদেশের বিভিন্ন মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ২৫০ প্রজাতির মৎস্য পাওয়া যায়।
মৎস্য প্রোটিন ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটিয়ে থাকে।	

পাঠ সংক্ষেপঃ

মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এক্ষেত্রে স্বেতস্বর্ণ (White Gold) হিসেবে পরিচিত চিংড়ীর অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নদী -নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, হাওর- বাওড়, নদীর মোহনা, উপকুল ও সমুদ্র অঞ্চল প্রভৃতি মৎসের প্রধান ক্ষেত্র। বাংলাদেশের এসকল মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ২৫০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। মৎস্যের উৎপাদন ক্ষেত্রের অবস্থান অনুযায়ী তাদের দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. অভ্যন্তরীন বা মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র এবং

খ. সামুদ্রিক বা লোনাপানির মৎস্য ক্ষেত্র।

দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে নানা ধরনের মাছ ও মাছ জাতীয় সম্পদে পরিপূর্ণ। সর্বপরি মৎস্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য সম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ---------- ভাগ।

১.২ বাংলাদেশের শতকরা --------- ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

১.৩ মৎস্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ বার্ষিক ---------- টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

১.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ---------- প্রজাতির মৎস্য পাওয়া যায়।

১.৫ রুই মাছ একটি ---------- পানির মৎস্য।

১.৬ সৌদি আরব বাংলাদেশ থেকে মৎস্য ---------- করে।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য সম্পদের অবদান কত?

ক) শতকরা ৫ ভাগ খ) শতকরা ১০ ভাগ

গ) শতকরা ১২ ভাগ ঘ) শতকরা ১৫ ভাগ

২.২ বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান কত?

ক) প্রায় ৪ ভাগ খ) প্রায় ৪.১২ ভাগ

গ) প্রায় ৫ ভাগ ঘ) প্রায় ৫.১২ ভাগ

২.৩ বাংলাদেশের কত শতাংশ জনগন মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসার সাথে জড়িত?

ক) প্রায় ৫ শতাংশ খ) প্রায় ১০ শতাংশ

গ) প্রায় ১৫ শতাংশ ঘ) প্রায় ২০ শতাংশ

২.৪ মাছ থেকে নিম্নের কোন উপাদানটি বেশী পাওয়া যায়?

ক) ভিটামিন খ) প্রোটিন

গ) কার্বোহাইড্রেট ঘ) ফ্যাট

২.৫ বাংলাদেশে কয় প্রজাতির মৎস্য পাওয়া যায়?

ক) ২০০ প্রজাতি খ) ২৫০ প্রজাতি

গ) ৩০০ প্রজাতি ঘ) ৩৫০ প্রজাতি

২.৬ ইলিশ মাছ কোথায় পাওয়া যায়?

ক) নদীর মোহনায় খ) গভীর সমুদ্রে

গ) নদীর উজানে ঘ) সবগুলোই ঠিক

২.৭ নিচের কোন দেশটি বাংলাদেশ থেকে মৎস্য আমদানি করে?

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ) চীন

গ) জাপান ঘ) সবগুলোই ঠিক

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের অবদান কতটুকু?

২. বাংলাদেশের কি পরিমাণ লোক মৎস্য শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে?

৩. বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

৪. মিঠাপানির মৎস্য ও লোনাপানির মৎস্যের উদাহরণ দাও।

৫. বাংলাদেশ থেকে কোন কোন দেশ মৎস্য আমদানি করে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলুন।

২. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে শ্রেণী বিভাগ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.৮

শিল্প
(Industries)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশে কি কি শিল্প আছে তার সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাবেন;
- দেশের শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান কারণসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখা পোষাক শিল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশের মানচিত্রের মাধ্যমে শিল্পগুলোর অবস্থান দেখতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি র্নিভর। কৃষিনির্ভর দেশ হলেও উন্নয়নশীল দেশের বিবেচনায় এ দেশে শিল্পের গুরুত্বও অপরিসীম। বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে এখনও সমৃদ্ধশালী নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশের শিল্পসমূহ হলোঃ পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, কাগজ শিল্প,সারশিল্প, চিনিশিল্প, পোশাকশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ঔষধ শিল্প, কৃষি-সম্পর্কিত শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রমাত্রার শিল্প প্রভৃতি। বেশীরভাগ শিল্পগুলোর অবস্থান হলোঃ বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা। বৃহত্তর ঢাকার মধ্যে শিল্প গুলোর অবস্থান হলো তেজগাঁও, হাজারীবাগ, ডেমরা, টঙ্গি, জয়দেবপুর, নরসিংদী এবং নারায়নগঞ্জ। চট্টগ্রামের মধ্যে এর অবস্থান হলো কালুরঘাট, নাসিরাবাদ, ষোলশহর, পতেঙ্গাঁ, কাপ্তাই, ভাটিয়ারী, বাড়বকুন্ড এবং ফৌজদারহাট। খুলনার মধ্যে এলাকাগুলো হলো শিরমণি, খালিসপুর, বয়রা এবং রুপসা উল্লেখযোগ্য। এ শিল্পগুলোর বেশীরভাগ অবস্থানই হলো নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে এবং নগরীর উপকণ্ঠ সমূহে। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহের বর্ননা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

পাট শিল্পঃ

পাটশিল্প গড়ে ওঠার পিছনে যে সকল ভৌগোলিক কারণ রয়েছে সেগুলো হল জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও শক্তি সম্পদ প্রাপ্তি। অর্থনৈতিক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে- কাঁচামাল প্রাপ্তি, দক্ষ ও সূলভ শ্রমিক, বাজার, মূলধন, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, সরকারের শিল্পনীতি ইত্যাদি। ১৯৫০সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন পাটকল গড়ে উঠেনি। ১৯৫১ সালে ১০০০ তাঁত নিয়ে নারায়নগঞ্জের আদমজীনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম পাটকল। এটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল। বর্তমানে আদমজী পাটকল অলাভজনক হওয়ার কারণে বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেসরকারী খাতে মোট ৯৯ টি পাটকল রয়েছে। বর্তমানে এগুলোর মধ্যে ৭৩টি চালু রয়েছে (উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,২০০৩, পৃঃ ১৬২)। নারায়নগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রাম প্রধান তিনটি পাটশিল্প কেন্দ্র। এছাড়া ডেমরা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, ভৈরববাজার, গৌরীপুর, মাদারীপুর, চাঁদপুর সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও পাটকল রয়েছে। এ পাটকলে সাধারণত চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এছাড়াও পাট থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, স্যান্ডেল, শো-পিস প্রভৃতি তৈরী করা হয়। নিম্নে সারনীতে বিগত কয়েক বছরের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ এবং রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত আয় দেখানো হলোঃ

সারণীঃ ৩.৮.১ : বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও আয় (১৯৯৭-২০০২)

সাল	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	অর্জিত আয় (মিলিয়ন ইউ,এস ডলার)
১৯৯৬-৯৭	৪০৫.০০	৩১৮
১৯৯৭-৯৮	৪১১.০০	২৮১
১৯৯৮-৯৯	৩৬৭.৯৩	৩০৪
১৯৯৯-০০	৩৩৯.০০	২৬৬
২০০০-০১	৩৪০.৩৭	২৩০
২০০১-০২	২৯৩.২২	২৪৪

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণী- ২৭, সারণী- ৪২

পাটক্রয়কৃত দেশসমূহঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিশর, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্য ব্যাবহার শুরু হওয়ায় বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। যার ফলস্বরুপ বাংলাদেশে পাট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট কমে গেছে।

বস্ত্রশিল্পঃ

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের প্রয়োজন। বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হলো তুলা যা বাংলাদেশে খুব কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বাৎসরিক বস্ত্রের চাহিদা ৮২৩ মিলিয়ন মিটার, কিন্তু দেশীয় বস্ত্রশিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন ৪৫০ মিলিয়ন মিটার। তাছাড়া প্রয়োজনীয় তুলার উৎপাদন বাংলাদেশে খুবই কম এবং নিম্নমানের। এজন্য বস্ত্রশিল্পকে তুলা আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে মোট বস্ত্র কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮টি। এসব বস্ত্রকলে তাঁতের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭১৭ টি। বস্ত্রকলের সংখ্যা ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ৪৪টি। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৬৩ টি বস্ত্র ও সুতাকল চালু রয়েছে। বর্তমানে ২৫ টি কল বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে। বস্ত্রশিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় রয়েছে। তবে এদের অধিকাংশ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাঁত শিল্পে নিয়োজিত আছে। বস্ত্রকলে প্রায় ৭৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত আছে। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন নিম্নে সারনীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী ঃ ৩.৮.২ :বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯২-২০০২

সাল	সুতা উৎপাদন (মিলিয়ন কে.জি	কাপড় উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)	সাল	সুতা উৎপাদন (মিলিয়ন কে.জি)	কাপড় উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)
১৯৯২-৯৩	৬০.৬০	৪৫.১০	১৯৯৭-৯৮	৫২.৮৮	১০.২৬
১৯৯৩-৯	৫৭.৩০	৩১.৬০	১৯৯৮-৯৯	৫৪.৮০	১১.১৫
১৯৯৪-৯৫	৪৯.১০	১৭.০০	১৯৯৯-০০	৫৮.০০	১১.৪১
১৯৯৫-৯৬	৪৯.৯০	১০.২৮	২০০০-০১	৬০.৮২	১৪.৭৩
১৯৯৬-৯৭	৫০.১৬	১০.৯০	২০০১-০২	৬৫.৫৮	১৬.১৪

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণী - ২৭।

বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। ঢাকা অঞ্চলে ঢাকা এবং এর আশেপাশে প্রায় ২৪টি বস্ত্রশিল্প স্থাপিত হয়েছে। টঙ্গি, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ, কাঁচপুর, ডেমরা, সাভার প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্র ও বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ফৌজদারহাট, ষোলশহর, পাঁচলাইশ, হালিশহর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বস্ত্র শিল্প কেন্দ্র। চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় প্রধান বস্ত্রশিল্প অঞ্চল। কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের দুর্গাপুর, দৌলতপুর হালিমা নগর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, দেবীদ্বার, ফেনী প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রকল রয়েছে। এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান বস্ত্র শিল্পাঞ্চল। বর্তমানে বাংলাদেশে যে বস্ত্র উৎপাদিত হয় তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে থাকে।

কাগজ শিল্পঃ

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি কাগজকল, ৪ টি বোর্ডমিল ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে। কাগজের কলগুলো হলো রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজকল, পাবনা জেলার পাকশীর উত্তরবঙ্গ কাগজকল, ছাতকের সিমেন্ট মন্ড ও কাগজ কল এবং নারায়নগঞ্জের মেঘনা ঘাটের নিকট বসুন্ধরা, মাগুড়া ও শাহজালাল কাগজকল। এছাড়া নিউজপ্রিন্ট কারখানার মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা উল্লেখযোগ্য। বোর্ড মিলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হার্ডবোর্ড মিলস্, আদমজী পাটকল বোর্ড মিলস, কাপ্তাই ও টঙ্গির বোর্ড মিলস উল্লেযোগ্য। কাগজ উৎপাদনের

কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাঁশ, নরমকাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবড়া, পাটকাঠি প্রভৃতি। এছাড়া বর্তমানে কাঁচাপাট দিয়েও কাগজ তৈরীর উন্নত প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে। কাগজকলগুলোতে প্রধানত লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ এবং প্রচুর নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। নিম্নে সারনীতে বিগত কয়েক বছরের কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট এর উৎপাদন দেখানো হলোঃ

সারণীঃ ৩.৮.৩ : কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯০-১৯৯৯।

সাল	কাগজ উৎপাদন (মে.ট.)	নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন (মে.ট.)	সাল	কাগজ উৎপাদন (মে.ট.)	নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন (মে.ট.)
১৯৯০-৯১	৪৩০৯৩	৪৭০০৫	১৯৯৫-৯৬	৪১৮২৯	৪৩৯৭২
১৯৯১-৯২	৪১২৯৩	৪৭০৬৮	১৯৯৬-৯৭	৩৯৮৪০	২৭৬৭৫
১৯৯২-৯৩	৪৩৪৫৫	৪৬২৯০	১৯৯৭-৯৮	৩৮২০৮	৭৬৭৩
১৯৯৩-৯৪	৪৪২৮৮	৪৬৫২৭	১৯৯৮-৯৯	৩৮২৮৯	২১৫৭৩
১৯৯৪-৯৫	৩৯৭৩৬	৪৩০৬২	--	--	--

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ বর্ষগ্রন্থ, ২০০০, সারণী ৫.১৩।

বাংলাদেশ কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে দেশের অধিকাংশ চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরে কিছু নিউজপ্রিন্ট রপ্তানি করে থাকে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার, নেপাল, ইরাক প্রভৃতি দেশে কাগজ রপ্তানী করে থাকে। কাগজ শিল্পে কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য, শক্তি সম্পদ প্রভৃতির অভাব বিরাজমান রয়েছে। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কাঁচামালের সুষ্ঠ সরবরাহ, পর্যাপ্ত ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশ্ববাজার সৃষ্টি প্রভৃতি।

সার শিল্পঃ

বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে সারের গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরনের জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল আর এর জন্যই ভুমির একর প্রতি ফসল বৃদ্ধির জন্য সারের প্রয়োজন রয়েছে। জমিতে জৈব সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারশিল্প গড়ে উঠার জন্য যে সকল নিয়ামক প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো হলো কাঁচামালের পর্যাপ্ততা, শক্তি সম্পদের প্রাপ্তি, বাজার, সুলভ শ্রমিক ও সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে ৮টি সারকারখানা থেকে সার উৎপাদিত হচ্ছে। সারকারখানাগুলো হলো ঘোড়াশাল সারকারখানা, আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ও যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশের বিগত কয়েক বছরের সারের উৎপাদন দেখানো হলো-

সারণী: ৩.৮.৪: সার উৎপাদন, বাংলাদেশ ১৯৯২-২০০২

সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)	সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)
১৯৯২-৯৩	২০৫০.৬০	১৯৯৭-৯৮	২০৩০.৬৭
১৯৯৩-৯৪	২৩৬৬.১০	১৯৯৮-৯৯	১৭৯৯.৩৬
১৯৯৪-৯৫	২১৪৪.৯০	১৯৯৯-২০০০	২০৩০.৬৭
১৯৯৫-৯৬	২২৪৮.০০	২০০০-২০০১	১৭৯৯.৩৬
১৯৯৬-৯৭	১৭৭২.৬৬	২০০১-২০০২	১৯০৪.০২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০০৩, সারণী-২৭।

সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ন না হওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর সার আমদানি করে। ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা মূল্যের সার আমদানি করে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা; ২০০৩, সারণী-৪৩)। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সারশিল্প উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

চিনি শিল্পঃ

চিনি শিল্প বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। চিনি খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে ৫ টি চিনির কল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭টি চিনির কল রয়েছে। বাংলাদেশের চিনিকলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শ্যামপুর চিনির কল , সেতাবগঞ্জ চিনির কল, ঠাকুরগাঁও চিনির কল, দর্শনা চিনির কল, ফরিদপুর চিনির কল প্রভৃতি। চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আখ। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আখের উৎপাদন ভাল হয়। তাই আবহাওয়া ও মৃত্তিকাজনিত কারনে বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। চিনির কলগুলো বেশির ভাগই দেশের উত্তর ও পশ্চিমে অংশে অবস্থিত। ১৯৯৪-৯৫ সালে চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদনের পরিমান ছিল ২.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৯২-২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

সারণীঃ ৩.৮.৫: চিনি উৎপাদন, বাংলাদেশ ১৯৯২-২০০২

সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)	সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)
১৯৯২-৯৩	১৮৭.৫০	১৯৯৭-৯৮	১৬৬.৪৬
১৯৯৩-৯৪	২২১.৪০	১৯৯৮-৯৯	১৫২.৯৮
১৯৯৪-৯৫	২৭০.১০	১৯৯৯-২০০০	১২৩.৪৩
১৯৯৫-৯৬	১৮৪.০০	২০০০-২০০১	৯৭.৮২
১৯৯৬-৯৭	১৩৫.৩২	২০০১-২০০২	২০৪.৩৩

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারনী -২৭।

বাংলাদেশের চিনি শিল্পের প্রধান সমস্যা হল আখ সরবরাহের অনিশ্চয়তা। আখ উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য একদিকে যেমন চিনিকলগুলো পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না অপরদিকে তেমনি আর একটি সমস্যা হল মাঠেই গুড় উৎপাদনের প্রবণতা।

পোশাকশিল্পঃ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ন শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। অভ্যন্তরীন বাজারে বিক্রির জন্য ষাটের দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প উৎপাদন শুরু করে ক্রমান্বয়ে এ শিল্পে রপ্তানী মুখী উৎপাদন শুরু হয়েছে। ১৯৮৩ সালের শেষ নাগাদ সারাদেশে মাত্র ৯২ টি রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এর পরবর্তীতে এ শিল্প অতি দ্রুত বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের শীর্ষে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক কারখানাগুলি কাঁচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণের জন্য আমদানির ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। এসব পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সামর্থ্য সীমিত। রপ্তনীযোগ্য তৈরী পোশাক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাঁত বস্ত্রের প্রায় ৯০ ভাগ এবং বুনন কাপড়ের শতকরা ৬০ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।কিন্তু বর্তমানে ২০০৫ সালের প্রারম্ভেই কোটামুক্ত গার্মেন্টস শিল্প চালু হওয়ায় এ শিল্পের বিশ্ববাজারে রপ্তানীর ক্ষেত্রে এক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমেই বিশ্বের বাজারে এ শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় এক হাজারের মতো রপ্তানীমুখী পোশাকশিল্প ইউনিট রয়েছে। এগুলোর প্রায় ৭৫% ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত। অবশিষ্ট ইউনিটগুলোর প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে। এ শিল্পে প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় আছে। এদের শতকরা ৮৫ জনই মহিলা। ২০০১-২০০২ সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ প্রায় ১৭৯৪৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যা মোট রপ্তানীর আয়ের প্রায়৫২%। নিম্নের সারণীতে কয়েক বছরের পোষাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়ের তালিকা দেখানো হলোঃ

সারনীঃ ৩.৮.৬: পোশাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়, বাংলাদেশ

সাল	মোট রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)	তৈরি পোষাকের রপ্তানীর আয় (কোটি টাকায়)	মোট রপ্তানী আয়ে তৈরি পোষাকের অংশ (শতকরা হার)
১৯৯০-৯১	৬১২৯.৮২	২৬২৬.০৪	৪২.৮৪
১৯৯৫-১৯৯৬	১৫৮৫৪.০৯	৭৯৫৯.৭২	৫০.২১
১৯৯৮-১৯৯৯	২৫৫৮৭.১৪	১৪৩৪৫.৯১	৫৬.০৬
১৯৯৯-২০০০	২৮৯৩৮.৩১	১৫৫১০.৫৭	৫৩.৫৯

২০০০-২০০১	৩৪৮৯৫.৯৩	১৮১৫২.১৪	৫২.০১
২০০১-২০০২	৩৪৩৩৭৭.৬০	১৭৯৪৬.৮৮	৫২.২০

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণী -৪২।

মানচিত্র-৩.৮.১

রপ্তানীকৃত দেশসমূহঃ

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী পোশাক রপ্তানী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এরপরে রয়েছে জার্মানীর অবস্থান। এরপরে যথাক্রমে ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন, নেদারল্যন্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও অন্যান্য দেশ। বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকুল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে স্বল্প মজুরীতে শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা অন্যতম। পোশাক শিল্পকে বর্তমানে বলা হয় "বিলিয়ন ডলার" শিল্প।

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পের অবস্থান হলো নদী তীরবর্তী এলাকা সমূহ এবং নগরীর উপকণ্ঠসমূহ।	বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র শিল্প।
বাংলাদেশের চিনি শিল্পের প্রধান সমস্যা হলো আখ সরবরাহের অনিশ্চয়তা।	পোষাক শিল্পকে বলা হয় "বিলিয়ন ডলার" শিল্প।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশের শিল্পসমূহ হলো- পাট শিল্প, কাগজ শিল্প, বস্ত্রশিল্প, সার শিল্প, চিনি শিল্প, পোষাক শিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি। পাট থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, স্যান্ডেল, শোপিস প্রভৃতি তৈরী করা হয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র শিল্প। বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাঁশ, নরম কাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবরা প্রভৃতি। বাংলাদেশ কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে দেশের অধিকাংশ চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরে কিছু নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী করে। পোষাক শিল্পকে বলা হয় " বিলিয়ন ডলার " শিল্প।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত ---------- নির্ভর।
১.২ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প কারখানা ---------- তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে।
১.৩ বাংলাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ---------- নগরে।
১.৪ ---------- সালে বাংলাদেশে প্রথম কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়।
১.৫ বাংলাদেশে বর্তমানে ---------- টি সারকারখানা আছে।
১.৬ চিনি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো ---------- ।
১.৭ গত ২০০২ সালে পোষাক শিল্প মোট রপ্তানীতে ---------- শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
১.৮ বিলিয়ন ডলার শিল্প বলা হয় ---------- কে।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কি নির্ভর?
ক) কৃষি খ) শিল্প
গ) বাণিজ্য ঘ) রপ্তানী

২.২ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পকারখানা কোন এলাকায় গড়ে উঠেছে?
ক) উপকূলে খ) নদীর তীরে
গ) সমুদ্রের নিকট ঘ) গ্রাম এলাকায়

২.৩ পাট শিল্প গড়ে উঠার পেছনে নিচের কোন কারণটি বেশী ভূমিকা রাখে?
ক) জলবায়ু খ) ভূ-প্রকৃতি
গ) মৃত্তিকা ঘ) উপরের সবগুলোই

২.৪ বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কি?
ক) পাট খ) তুলা
গ) সার ঘ) চিনি

২.৫ কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে নীচের কোনটি ব্যবহৃত হয় না?
ক) বাঁশ খ) নরম কাঠ
গ) পাটকাঠি ঘ) সুন্দরী গাছ

২.৬ বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ফেঞ্চুগঞ্জ খ) আশুগঞ্জ
গ) ঘোড়াশাল ঘ) চট্টগ্রাম

২.৭ বাংলাদেশের অধিকাংশ চিনিকলগুলো কোথায় অবস্থিত?
ক) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে খ) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে
গ) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে

২.৮ বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস শিল্প কোথায় অবস্থিত?
ক) ঢাকা শহর খ) চট্টগ্রাম শহর
গ) খুলনা শহর ঘ) বরিশাল শহর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশে কি কি শিল্প কারখানা আছে?
২. বাংলাদেশের পাট শিল্প গড়ে উঠার পেছনে প্রধান কারণ কি কি?
৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি চিনি কল আছে?
৪. পোষাক শিল্পকে কেন "বিলিয়ন ডলার" শিল্প বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ কি কি? জাতীয় উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান সংক্ষেপে বর্ননা করুন।

পাঠ-৩.৯

বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও বাণিজ্য
Transport & Trade of Bangladesh

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

◆ বাংলাদেশের পরিবহন ও যাতায়াত সম্পর্কে জানতে পারবেন;

◆ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং

◆ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের সমস্যাবলী ও রপ্তানী বানিজ্য বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

আধুনিক যুগে পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যাতায়াত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে সভ্যজগতে কাজকর্ম চালানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সহজ কথায়, যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন স্থানে **যোগাযোগের** মাধ্যমে এবং **মালপত্র ও লোক** চলাচলের মাধ্যমে। বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে **তিন** ভাগে ভাগ করা যায়: যথা- স্থল পরিবহন, জল পরিবহন এবং আকাশ পরিবহন। স্থল পরিবহন আবার দুই প্রকার, যথা- রেলপথ ও সড়ক পথ। তবে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হবার কারণে অসংখ্য খাল-বিল ও নদ-নদী জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে।

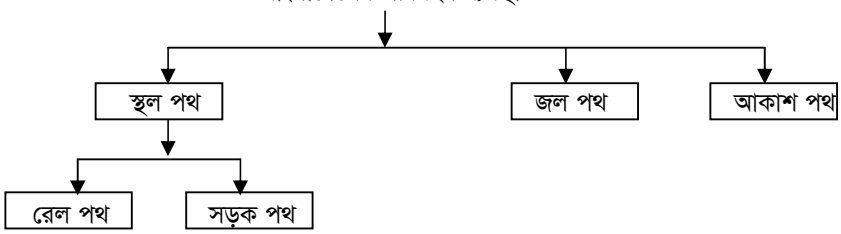

নিম্নে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার বিবরণ দেয়া হল:

১. স্থল পথ:

স্থল পথে যাতায়াত বলতে বোঝায় সড়ক পথ ও রেল পথে যাতায়াত। সড়ক পথে যাতায়াতের যানবাহন হল- বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি, মোটর সাইকেল, রিক্সা, সাইকেল, অটোরিক্সা প্রভৃতি। রেল পথে রেলগাড়ি যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ক. সড়ক পথ:

অসংখ্যা নদীনালা, খালবিল, বৃষ্টি পাতের আধিক্য, ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এবং আর্থিক অসুবিধা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণ ও মেরামত অত্য ব্যয় সাপেক্ষ। ১৯৪৭ সালে দেশে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল মাত্র ১,৯৩১.১৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী সড়ক পথ ছিল মাত্র ২৮৬.২৩ কিলোমিটার। নিম্নের সারনীতে সড়ক ও পরিবহন অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সড়কের উপাত্ত (১৯৯৪-২০০৩) পর্যন্ত তুলে ধরা হল:

৩.৯.১. সারনী বিভিন্ন প্রকার সড়ক পথের দৈর্ঘ্য (কি. মি.) : (১৯৯৪-২০০৩)

সাল (জুন ৩০ পর্যন্ত)	জাতীয় সড়ক (কি. মি)	আঞ্চলিক সড়ক (কি. মি)	সংযোগ সড়ক এ ধরণ (কি. মি)	মোট (কি. মি.)
১৯৯৪	২৯২০	১৬৮৭	১১০৬৩	১৫৬৭০
১৯৯৫	২৯২০	১৭০০	১১৪৫০	১৫৬৭০
১৯৯৬	২৯২০	১৭০০	১২৯৩৪	১৭৫৫৪
১৯৯৭	২৯২০	১৭০০	১৫৫৬	২৬২৭৬
১৯৯৮	৩১৪৪	১৭৪৬	১৫৯৬৪	২০৮৫৪
১৯৯৯	৩০৯০	১৭৪২	১৬১১৬	২০৯৫৮
২০০০	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৩	৩৪২০	৪২৪১	১৬১৩৮	২০৭৯৯

উৎস: সড়ক ও পরিবহন অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সড়ক পথে যান্ি ক যানবাহনের পাশাপাশি বহু সংখ্যক পুরাতন যানবাহন যথা-রিক্সা, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশের সড়কপথের একটি বৈশিস্ট্য হলো-নদীর কারণে সড়ক পথগুলো বহু জায়গায় বিচিছন্ন। এর জন্য সড়কপথে সংযোগ রাখার জন্য ফেরী সার্ভিসের প্রবর্তন করা হয়েছে। যমুনা বহুমুখী সেতুর মাধ্যমে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে সংযোগ করা হয়েছে। দেশের সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সড়কগুলো জাতীয় জনপথ, জেলা রাস্তা, পৌরসভার রাস্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তা নামে বিভক্ত।

খ. রেলপথঃ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশ রেলপথের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,৮৫৭ কিলোমিটার। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে ২,৭০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ ছিল। ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশে ২,৭৬৮.৩৭ কিলোমিটার রেলপথ ছিল। (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, সারনী ৩৭, পৃষ্ঠা-২০১)। এটি বাংলাদেশ রেলপথ নামে পরিচিত। এ রেলপথ দুই ধরনের। যথা-ব্রডগেজ এবং মিটার গেজ।

বাংলাদেশ ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় ৮৮৪ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে ৯৩৬.২৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ আছে। এ ধরনের রেলপথ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। এছাড়া ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলায় সামান্য ব্রডগেজ রেলপথ আছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১,৮২২ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ ছিল এবং বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িযেছে ১,৮৩২,১২ কিলোমিটার মিটারগেজ। এর অধিকাংশ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অবস্থিত, বাংলাদেশে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ রেলপথ যমুনা নদী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে সম্পূর্ণ মিটারগেজ রেলপথ, পশ্চিম ভাগে ৯৩৬.২৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ এবং অবশিষ্টাংশ মিটারগেজ। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা ব্যতীত দেশের সব জেলাতেই রেলপথ রয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথে সর্বমোট ৪৫৯টি রেলস্টেশন আছে। (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০০১, সারনি ৮.০১)। এর মধ্যে লাকসাম, আখাউড়া, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ঈশ্বরদী, পার্বতীপুর, সান্তাহার এবং ঢাকার কমলাপুর জংশনের নাম উল্লেখ যোগ্য। রাজধানী ঢাকা থেকে রেলপথ যোগে দেশের প্রায় সব গুরূত্বপূর্ণ শহরে যাতায়াত করা যায়।

সারণীঃ ৩.৯.২: বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকান্ড

বিষয় সমূহ	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩
যাত্রী পরিবহন (মিলিয়ন)	৩৬৭৫.০০	৩৯৪০.৬৯	৪২০৯.০১	৩৯৭২.০০	৪০২৪.২১
পন্য পরিবহন টন কি.মি. (মিলিয়ন)	৪৯৬.৪০	৭৭৭.১০	৯০৭.৮৮	৯৫১.৮২	৯৫১.৯৯
রেলইঞ্জিনের সংখ্যা	২৭৯	২৬৮	২৭৭	২৭৭	২৭৫
পন্য পরিবহনের ওয়াগনের সংখ্যা	১২৮৭	১২৮২	১২৭৫	১২৭২	১২৭৩
করআদায় (কোটি টাকা)	১১১৫২	৪০৯২	১০৭৭৮	১০৬৩১	১০৬০৫
অন্যান্য কোচ সমূহের সংখ্যা	১৩৯	১৩৭	১৩৬	১৩৫	১৩৭
করের জন্য ব্যয় (কোটি টাকা)	৪১৬.১৫	৪৬৯.৮৬	৫২৩.৮৮	৫৩৫.৪৮	৪২০.১০

উৎস: বাংলাদেশ রেলওয়ে, যোগাযোগ মন্ত্রনালয় ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩

২. জলপথঃ

নদীপথে সাধারনত নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার এবং সমুদ্র পথে জাহাজ চলাচল করে।

ক. নদীপথঃ

এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-খাল-বিল। কিন্তু দেশের সব গুলো নদীই নাব্য নয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ আভ্যন্ রীন নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌ পলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নদীপথে ছোট ছোট নৌকা থেকে শুরু করে লঞ্চ, স্টীমার, সী-ট্রাক, ফেরী, ট্যাঙ্কার, কোস্টার প্রভৃতি যানবাহন যাতায়াত করে। সাধারনত দেশের দক্ষিন ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। তাই গুরূত্বপুর্ন নদী বন্দরগুলো এ অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী ও

খুলনা অন্যতম। অন্যান্য নদীবন্দরের মধ্যে ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, মীরকাদিম, আরিচা ও সিরাজগঞ্জের নাম উল্লেখযোগ্য।

খ. সমুদ্র পথঃ

সমুদ্রপথ ব্যবসা বানিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এ পথে সাধারনত ভারী ওজনের ও বৃহৎ আকারের পণ্য সামগ্রী বহন করা হয়। সমুদ্রপথে একদেশ থেকে অন্যদেশের সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্য করা হয়। বাংলাদেশে ব্যবসা বানিজ্যের সুবিধার জন্য রয়েছে দুইটি সমুদ্রবন্দর। একটি হলো চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং অন্যটি মংলা সমুদ্রবন্দর। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কর্নফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়। এ বন্দরের সঙ্গে রেল ও সড়ক পথের যোগাযোগ রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে অনেকগুলো জেটি রয়েছে এবং প্রায় ২৪ টির মতো জাহাজ এক সঙ্গে ভিড়তে পারে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ বানিজ্য এ বন্দরের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। মংলা সমুদ্রবন্দর খুলনা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিনে পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। এ বন্দরের সঙ্গে নদীপথ ও সড়কপথের যোগযোগ রয়েছে।

৩. বিমানপথকে আকাশপথও বলা হয়। আধুনিক যুগে বিমানে যাতায়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্রুত যাত্রী ও পন্য চলাচলের জন্য বিমানই সবচেয়ে ভাল মাধ্যম। বিমানপথ বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ দুই ধরনের বিমান সার্ভিস দেখা যায়। যথা- অভ্যন্তরীন বিমান সার্ভিস ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় বিমান চলাচল করার নামই হলো অভ্যন্তরীন বিমান সার্ভিস। অভ্যন্তরীন বিমান ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম থেকে যশোর, কক্সবাজার, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ বিমান যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলাচল করে তখন তাকে বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক সার্ভিস বলা হয়। আন্তর্জাতিক রুটে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা যায়। ঢাকার কুর্মিটোলা একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এর নাম জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এটি বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর। এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বাংলাদেশ বিমান সংস্থার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

বাণিজ্য (Trade)

মানুষের অভাব ও চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে পন্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলীকে বাণিজ্য বলে। প্রাচীনকাল থেকে শুরূ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাণিজ্য দেশের অর্থনীতিতে গুরূত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। প্রাচীনকালে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু না থাকার কারনে পন্য বিনিময়ের মাধ্যমে বাণিজ্যের সূচনা হয় পণ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদানের নামই হলো বাণিজ্য। বানিজ্যের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভরকরে বাণিজ্যকে দুই ভাগেভাগ করা যায়। যথা:- ১) অভ্যন্তরীন বাণিজ্য ও ২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

১. অভ্যন্তরীন বানিজ্যঃ

দেশের ভেতর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন পন্য ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীন বাণিজ্য বলে।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যঃ

এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পন্য যখন ক্রয়-বিক্রয় বা আদান প্রদান হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বানিজ্য আবার দুই ধরনেরঃ যথা- ক) আমদানি বানিজ্য ও খ) রপ্তানি বানিজ্য।

আমদানি বানিজ্যঃ

দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য যখন অন্য দেশ থেকে স্বদেশে কোন পন্য সামগ্রী আনা হয় তখন তাকে আমদানি বানিজ্য বলে। উদাহরন স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে- বাংলাদেশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শিশু খাদ্য, কলকব্জা, খাদ্যসামগ্রী, শিল্পের কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য, ওষুধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ভোগ্যপন্য প্রভৃতি আমদানি করে দেশের ঘাটতি পূরন করতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো:-

অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপন্যঃ

খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি পূরনের জন্য চাল, গম, ভোজ্য তেল, শিশু খাদ্য, তেলবীজ প্রভৃতি আমদানি করতে হয়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদিঃ

শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কয়লা, সিমেন্ট, ডিজেল, পেট্রোল, তুলা, সুতা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি প্রধান আমদানি দ্রব্য।

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল:

কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নত। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি যন্ত্রাতি, কীটনাশক ওষুধ, উন্নত বীজ ও সার প্রভৃতির প্রয়োজন। অন্যদিকে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল প্রভৃতি দরকার। সে জন্য এ সব দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়।

এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ ওষুধপত্র, কাঁচ, মোটরগাড়ি, সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, বাস, ট্রাকের চেসিস, রবারজাত দ্রব্য প্রভৃতি পন্য সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করে। বাংলাদেশ পৃথিবীর যে সকল দেশ থেকে সাধারনত পন্য আমদানি করে থাকে সেগুলো হলো- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি।

রপ্তানী বাণিজ্য:

স্বদেশের কোন পন্য যখন অন্য কোন দেশে পাঠানো হয় তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। উদাহরন হিসেবে বলা যায়- বাংলাদেশের তৈরী পোশাক, পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। নিচে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্যাদির বর্ণনা দেওয়া হলো:

তৈরী পোশাক:

বর্তমানে তৈরী পোশাক রপ্তানী করে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ১২,৯২৪ কোটি টাকার এবং ২০০১-২০০২ সালে ১৭,৯৪৭ কোটি টাকার তৈরী পোশাক রপ্তানি করা হয়।

কাঁচাপাট:

বিশ্বের মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা ৭৫ ভাগ এক সময় বাংলাদেশ উৎপন্ন হত। যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের কাঁচাপাটের প্রধান ক্রেতা।

পাটজাত দ্রব্য:

বাংলাদেশের পাটকলে উৎপাদিত চট, থলে, বস্তা, গালিচা, প্রভৃতি বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ পাটজাত দ্রব্য থেকে অর্জিত হয়। জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হয়।

চা:

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা এর স্থান ষষ্ঠ। বাংলাদেশে মোট ১৫৮টি চা বাগান আছে। যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, জাপান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের চা রপ্তানী করে থাকে।

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য:

বাংলাদেশ প্রতি বছর গরু, মহিষ ও ছাগলের চামড়া রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য চতুর্থ স্থানের অধিকারী। প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, বেলজিয়াম, প্রভৃতি দেশের বাংলাদেশের চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী করে।

মাছ ও হিমায়িত খাদ্য:

বাংলাদেশ থেকে টাটকা ও শুকনা মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানী করা হয়।

সারনীঃ ৩.৯.৩: বাংলাদেশের রপ্তানীর মাধ্যমে আয় (১৯৯৮-২০০২) (মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার)

পন্য দ্রব্যাদি	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২
১) তৈরী পোশাক	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩	৩৩৬৪	৩১২৫
২) পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৩৮৯	৩৭৬	৩৩৮	২৯৭	৩০৫
৩) হিমায়িত খাদ্য	২৯৪	২৭৪	৩৪৪	৩৬৩	২৭৬
৪) চামড়া	১৯০	১৬৮	১৯৫	২৫৪	২০৭
৫) রাসায়নিক দ্রব্য	৭৪	৭৯	৯৪	৯৭	৬৭
৬) চা	৪৭	৩৯	১৮	২২	১৭

৭) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৬	৮	৫	৭	৬
৮) কাগজ ও পহজত দ্রব্য	-	-	-	১	-
৯) অন্যান্য	১৩২৯	১৩৯৫	১৬৭৫	২০৬২	১৯৮৩
মোট	৫১২৭	৫৩২৪	৫৭৫২	৬৪৬৭	৫৯৮৬

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনেতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারনী ৪২ এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বানিজ্য মন্ত্রনালয়।

কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট:

দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ প্রতিবছর কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী করে থাকে।

অন্যান্য:

অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যগুলো হলো ফার্নেস তেল, হস্তশিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি। নিম্নে সারণীতে বাংলাদেশের আমদানী খাতে অর্থব্যয় এবং রপ্তানী খাতে অর্থ উপার্জনের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

সারনীঃ ৩.৯.৪ : বাংলাদেশের আমদানী ও রপ্তানী ১৯৯৫-২০০৩ (মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার)

সাল	আমদানী ব্যয়	রপ্তানী আয়
১৯৯৫-৯৬	৬৯৪৭	৩৮৮৪
১৯৯৬-৯৭	৭১৫২	৪৪২৭
১৯৯৭-৯৮	৭৫২০	৫১৭২
১৯৯৮-৯৯	৮০০৬	৫৩২৪
১৯৯৯-২০০০	৮৩৭৪	৫৭৫২
২০০০-২০০১	৯৩৩৫	৬৪৬৭
২০০১-২০০২	৮৫৪০	৫৯৮৬
২০০২-২০০৩	৯৬৫৮	৬৫৪৮.৪৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনেতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারনী ৪২ ও ৪৩

আমাদের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার হচ্ছেনা। এর ফলে আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হচেছ। বৈদেশিক বানিজ্যে রপ্তানী বৃদ্ধি করে আমাদের অর্থনীতিকে উন্নত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানী শুল্ক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রপ্তানীযোগ্য পন্যের ব্যাপক ব্রাপক প্রচার প্রভৃতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের সমস্যাবলী:

বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. সুষ্ঠ রপ্তানী নীতির অভাব:

বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের অন্যতম সমস্যা হলো সুষ্ঠু বাণিজ্য নীতির অভাব। স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি বিদ্যমান থাকায় বাণিজ্য নীতি প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। যার ফলস্বরূপ রপ্তানীকারকদের বিশেষ অসুবিধা হয়।

২. স্বল্পসংখ্যক রপ্তানী দ্রব্য:

বাংলাদেশের রপ্তানী পন্যের সংখ্যা কম বলে রপ্তানী বানিজ্যের আয় খুবই কম। এ রপ্তানী পন্যের মধ্যে কেবল পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, তৈরী পোশাক, অপ্রচলিত পন্য প্রভৃতি প্রধান। তাই রপ্তানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. নিম্নমানের রপ্তানী পন্য:

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাপূর্ন বাজারে পন্যের ভাল বাজার পেতে হলে পন্যের মান উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের পন্য অত্যন্ত নিম্নমনের হবার কারনে বিশ্ববাজারে এই পন্যের চাহিদা বেশ কম।

৪. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি:

শ্রমিক অসন্তোষ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশী পন্যের উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে প্রতিযোগিতাপূর্ন বাজারে বাংলাদেশী পন্য টিকে থাকতে পারছে না।

৫. প্রচারের অভাব:

প্রচারের মাধ্যমে পন্যের বাজার সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশী পন্যের প্রচার অত্যন্ত সীমিত।

৬. জাহাজের অভাব:

পন্য রপ্তানীর জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় জাহাজের খুবই অভাব। ফলে বিদেশী জাহাজের উপর সর্বদা নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। এতে একদিকে যেমন পরিবহন খরচ বেশী পড়ে, অন্য দিকে সময়মত মালপত্র যথাস্থানে প্রেরন করা সম্ভব হয় না। ফলে রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির উপায়সমূহঃ

বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. রপ্তানী যোগ্য পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধিঃ

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম রপ্তানীযোগ্য পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এরজন্য পাট, চা, তামাক, প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের এবং কলকারখানায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাসঃ

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। উৎপাদন খরচ কম হলে কম মূল্যে বিদেশে পন্য রপ্তানী করা যায়। ফলে বিদেশে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বাজার প্রসারিত হয়। সাধারণত উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন পন্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা যায়।

৩. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিঃ

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে অল্প সময়ে কম খরচে পন্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করা যায়। এর ফলে রপ্তানীর পরিমান বৃদ্ধি পায়।

৪). বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনঃ

সর্বোপরি বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।

বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।	বাংলাদেশের রেলপথে সর্বমোট ৪৫৯টি রেলস্টেশন আছে।
বাংলাদেশের প্রায় ৮৪০০ কি.মি. দীর্ঘ অভ্যন্তরীন নাব্য জলপথ রয়েছে।	বাংলাদেশে মোট ২৫৮টি চা বাগান আছে।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য পন্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন।

পাঠ সংক্ষেপঃ

আধুনিক যুগে পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করে। দেশের সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথে মোট ৪৫৯টি রেলস্টেশন আছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ বাণিজ্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বাণিজ্যের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বাণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল প্রভৃতি দরকার। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম রপ্তানীযোগ্য পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যয়ন- ৩.৯

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন স্থানে ..... মাধ্যম এবং ..... চলাচলের মাধ্যম।

১.২ বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে ..... ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১.৩ স্থলপথে যাতায়াত বলতে বুঝায় ..... ও ..... যাতায়াত।

১.৪ দেশের সড়কপথের উন্নয়নের জন্য ..... নামে একটি সংস্থা আছে।

১.৫ বাংলাদেশের রেলপথে সর্বমোট ..... টি রেলস্টেশন আছে।

১.৬ বাংলাদেশে প্রায় ..... কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীন নাব্য জলপথ রয়েছে।

১.৭ চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের ..... বলা হয়।

১.৮ বাণিজ্যের ধরণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বানিজ্যকে ..... ভাগে ভাগ করা যায়।

১.৯ স্বদেশের পন্য যখন অন্যকোন দেশে পাঠানো হয় তখন তাকে ..... বলে।

১.১০বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা এর স্থান .....।

১.১১ বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে .....বানিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের যাতায়াত/পরিবহন ব্যবস্থাকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?

ক. চার ভাগে খ. পাঁচ ভাগে গ. দুই ভাগে ঘ. তিন ভাগে

২.২ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. সুরমা নদী খ. সাঙ্গু নদী গ. মেঘনা নদী ঘ. কর্নফুলী নদী

২.৩ বানিজ্যের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বানিজ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে গ. চার ভাগে ঘ. কোনটিই নয়

২.৪ দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য অন্য দেশ থেকে স্বদেশে কোনো পন্য সামগ্রী আনা হয় তখন তাকে কি বলে?

ক. রপ্তানী বানিজ্য খ. আমদানি বানিজ্য গ. রপ্তানী ও আমদানি বানিজ্য ঘ. কোনটিই নয়

২.৫ বাংলাদেশে মোট কতটি চা বাগান আছে?

ক. ১৫৫টি খ. ১৫৯টি গ. ১৫৮টি ঘ. ১৮০টি ২.৬

বাংলাদেশের রপ্তানীবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে কি ধরনের বানিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা উচিত?

ক. সল্পমেয়াদী খ. দীর্ঘ মেয়াদী গ. উভয় ঘ. কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত উত্ত দিনঃ

১. বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার শ্রেনীবিভাগ করুন।

২. সংক্ষেপে বাংলাদেশের রেলপথের বিবরন দিন।

৩. বানিজ্য কি? বানিজ্যের শ্রেনীবিভাগ করে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. বাংলাদেশের আমদানি পন্য ও পণ্ডানী দ্রব্যের নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার শ্রেনীবিভাগ উল্লেখ পূর্বক বিবরন দিন।

২. বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের সমস্যাবলি ও রপ্তানী বৃদ্ধির উপায়সমূহ লিখুন।

ইউনিট-৩

উত্তরমালা

পাঠ ৩.১

২.১. ক, ২.২. ঘ, ২.৩. খ, ২.৪. গ, ২.৫. খ

পাঠ ৩.২

২.১. খ, ২.২. ক, ২.৩. ঘ, ২.৪. খ, ২.৫. ক, ২.৬. ক, ২.৭. গ

পাঠ ৩.৩

২.১. ঘ, ২.২. ক, ২.৩. গ, ২.৪. গ, ২.৫. খ, ২.৬. ক, ২.৭. গ

পাঠ ৩.৪

২.১. খ, ২.২. ক, ২.৩. ক, ২.৪. খ

পাঠ ৩.৫

২.১. ঘ, ২.২. ঘ, ২.৩. গ, ২.৪. গ, ২.৫. ক, ২.৬. গ, ২.৭. ঘ

পাঠ ৩.৬

২.১. ক, ২.২. ক, ২.৩. খ, ২.৪. গ, ২.৫. গ

পাঠ ৩.৭

২.১. ক, ২.২. ঘ, ২.৩. খ, ২.৪. খ, ২.৫. খ, ২.৬. ক, ২.৭. ঘ

পাঠ ৩.৮

২.১. ক, ২.২. খ, ২.৩. ঘ, ২.৪. খ, ২.৫. ঘ, ২.৬. ক, ২.৭. খ, ২.৮. ক

পাঠ ৩.৯

১.১. যোগাযোগের, মালপত্র ও লোক
১.২. তিন
১.৩. সড়ক পথ, রেলপথ
১.৪. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা
১.৫. ৪৫৯
১.৬. ৮৪০০
১.৭. প্রবেশদ্বার
১.৮. দুই
১.৯. রপ্তানী বাণিজ্য
১. ১০. ষষ্ঠ
১.১১. দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী

২.১. ঘ, ২.২. ঘ, ২.৩. ক, ২.৪. খ, ২.৫. গ, ২.৬. খ

গ্রন্থপুঞ্জি

References

ইউনিট-১

পাঠ ১ঃ বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়

(Geo-political evolution of Bangladesh)

১. হক লুতফুল (১৯৯৪), গোষ্ঠী ঘর ও মানব ভবিতব্য ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বরাজনীতি, নাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা।
২. তাহা, আবু (১৯৮৮), রাজনৈতিক ভূগোল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন বোর্ড, রাজশাহী।
৩. তাহা, আবু (১৯৯৯), জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন বোর্ড, রাজশাহী।
৪. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka
৫. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.
৬. OHK. Spate & A.T.A Learmounth. (1967): India and Pakistan: A General & Regional Geogaphy, 3rd ed. Methuene, London.
৭. D.N. Wadia (1968) Geology of India.
৮. রাইছ উদ্দিন, মোঃ (১৯৮৮), বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ঢাকা।
৯. Eaton, R.M. (2004), The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, Scholarship edition, Ca. University.

পাঠ ২ঃ বাংলাদেশের ভূ-সংস্থান

(Topography of Bangladesh)

১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত- (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, ঢাকা।
২. চৌধুরী, মোঃ হোঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।
৩. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), অর্থনৈতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাবিঃ সংরস্করণ।
৪. রাইছ উদ্দিন (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস।
৫. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka.
৬. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.

পাঠ ৩ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু

(Climate of Bangladesh)

১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত- (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, ঢাকা।
২. চৌধুরী, মোঃ হোঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।
৩. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), অর্থনৈতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাবিঃ সংরস্করণ।
৪. রাইছ উদ্দিন (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস।
৫. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka.
৬. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.

ইউনিট-২

পাঠ ১ঃ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
6. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
7. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ২ঃ গঙ্গা-পদ্মানদী ব্যবস্থা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938), The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.

৬. Mojumder, S.C. (1942), Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944), The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ৩ ঃ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫ Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
৬. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ৪ ঃ মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
৬. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ৫ ঃ বাংলাদেশে বন্যা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
৬. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

ইউনিট-৩

1. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka.
2. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.
৩. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
৪. মিঞা, মঃ (১৯৮৮) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত- (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, ঢাকা।
৬. চৌধুরী, মোঃ হোঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।
৭. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), অথৎনতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাবিঃ সংরস্করণ।
৮. রাইছ উদ্দিন (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস।
৯. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১০. ৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।